স্নায়ুশল্যচিকিৎসা শাস্ত্রের ক্রমবিবর্তন ও স্নায়ুমণ্ডলের অর্বুদ রোগ



ডাঃ অশোক কুমার বাগচী

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

স্নায়ু শল্যচিকিৎসাশাস্ত্রের ক্রমবিবর্তন ও স্নায়ুমণ্ডলের অর্বুদ রোগ

COMPLIMENTARY

ডঃ অশোক কুমার বাগচী

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

SNAYU SALYACHIKITSHA SASTRER KRAMAVIVARTAN O SNAYUMANDALER ARBUDA ROGA

Dr. Ashok Kumar Bagchi

প্রকাশ কাল—এপ্রিল, ১৯৮৬

প্রকাশক ঃ
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)
আর্য ম্যানসন (নবম তল)
৬এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার
কলকাতা-৭০০০১৩

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীসুধাতোষ বসু
ইম্প্রেশন
৩৩বি, মদন মিত্র লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ ঃ দুর্গা রায়

মূল্য ঃ বারো টাকা

Published by Professor Ladlimohan Roychoudhury, Chief Executive Officer, West Bengal State Book Board under the centrally sponsored scheme of production of books and literature in regional language at the University level, launched by the Government of India, the Ministry of Education and Social Welfare (Department of Culture), New Delhi.

মুখবন্ধ

স্নায়ুশল্যশাস্ত্র ও স্নায়ুমণ্ডলের অর্বুদ সম্বন্ধে জ্ঞান প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে মানুষ লাভ করেছে। কালের বিবর্তনে উক্ত শাস্ত্রের ক্রমোন্নতি হয়ে বহু রোগক্লিষ্ট মানুষকে সুস্থ ও দীর্ঘজীবন লাভে সহায়তা করে চলেছে।

আজ প্রায় তিন দশক কাল হ'ল ভারতেও আধুনিক স্নায়ুশল্যশাস্ত্রের চর্চা আরম্ভ হয়েছে এবং উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করছে কিন্তু আপামর জনসাধারণের মধ্যে সেই জ্ঞান ব্যাপকভাবে ব্যপ্ত হয়নি। ইংরাজী ছাড়া অন্য কোনও ভারতীয় ভাষাতে উক্ত বিষয়ের প্রামাণ্য পুস্তক নেই। ব্যবসায়িক জীবনের অফুরন্ত অবসরে আমার কিছু কিছু লেখবার স্পৃহা আছে। সেই স্পৃহার বশবর্তী হয়ে আমি ত্রিশ বৎসর পূর্বে 'যুগান্তর' পত্রিকার সাময়িকী ক্রোড়পত্রে জনসাধারণের জ্ঞাতব্য চিকিৎসা বিষয়ক প্রবন্ধ লিখতাম। সেই সময়ে আমি প্রবাসী ছিলাম। অতি অল্পকাল পূর্বে আমি 'চিকিৎসাশাস্ত্র যুগে যুগে' নামক পুস্তকের মাধ্যমে সরল বাংলা ভাষায় একটি চিকিৎসাশাস্ত্রের ইতিহাস রচনা করেছি। সেই অনুপ্রেরণাতেই আমি এই পুস্তকটিও রচনা করেছি কেননা আমি মূলতঃ এক স্নায়ুশল্যচিকিৎসক।

আমার পূর্বসূরীরা কত কষ্ট সহ্য করে এবং বহু বাধা বিপত্তি অগ্রাহ্য করে আজ স্নায়ুশল্যশাস্ত্র জনসাধারণের উপকারের জন্য বিনিয়োগ করেছেন সেকথা স্মরণ করেই আমার এই পুস্তক রচনা। যদি বর্তমান পাঠকেরা এবং আমার উত্তরসূরীরা এই ক্ষুদ্র সচিত্র পুস্তকটি পাঠ করে কিছুমাত্র উৎসাহ লাভ করেন এবং উপকৃত হন তা'হলেই আমি পরম তৃপ্তিলাভ করব। যদি কোন সহৃদয় ও কুশলী অনুবাদক পুস্তকটির হিন্দী তর্জমা করেন তাহলে ভারতের অধিকাংশ ব্যক্তির পক্ষে বিষয়টি উপভোগ্য ও বোধ্য হবে এবং সত্য সত্যই প্রমাণিত হবে যে এটি "বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায় চ"। আমি আমার সানন্দ অনুমতি দিতে প্রস্তুত।

অশোক কুমার বাগচী

কলিকাতা
৩০শে নভেম্বর ১৯৮৪

উৎসর্গ

গ্রন্থটি আমার পরম শ্রদ্ধেয় নিদানতত্ত্বের অধ্যাপক প্রয়াত ডক্‌টর ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

এবং

পূর্বতন ভিয়েনাবাসী পরম শ্রদ্ধেয় প্রয়াত অধ্যাপক ডক্‌টর লিওপোল্ড স্যোন্‌বাউয়ের-এর পূণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত হল কেননা তাঁদের অনুপ্রেরণাতেই আমার চিকিৎসাশাস্ত্রের ইতিহাস পাঠের সূচনা হয়েছিল।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই পুস্তকটি প্রণয়নে যাঁরা আমাকে সাহায্য করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন আমার স্ত্রী শ্রীমতী সাধনা বাগচী, আমার সহকর্মিণী শ্রীমতী পাপিয়া ঘোষাল, পশ্চিমবঙ্গ পুস্তক পর্ষদ-এর পূর্বতন পরিচালক শ্রীদিব্যেন্দু হোতা, শ্রী অশোক বিশ্বাস এবং নিরীক্ষক ডাঃ সমর রায়চৌধুরী।

এছাড়া আলোকচিত্র শিল্পী শ্রী ভানু চক্রবর্তী এবং কলাশিল্পী শ্রী প্রেম ভট্টাচার্যও আমার পরম ধন্যবাদার্হ।

স্নায়ুশল্যচিকিৎসা শাস্ত্রের ক্রমবিবর্তন ও স্নায়ুমণ্ডলের অর্বুদ রোগ

মস্তিষ্কের তথা স্নায়ুশল্যচিকিৎসা শাস্ত্রের ক্রমবিবর্তন মূলতঃ তিনটি পর্যায়ভুক্ত করা যায়। যথা—

(১) প্রাগৈতিহাসিক মানব কর্তৃক করোটি ছিদ্রকরণ।

(২) তুরপুণ যন্ত্রের সাহায্যে করোটি ছিদ্রণের অন্তবর্তীকাল।

(৩) আধুনিক যুগের মস্তিষ্ক ও করোটি শল্য চিকিৎসা।

উক্ত প্রতি যুগের সমসাময়িক প্রযুক্তিকলার উৎকর্ষের উপর মানুষ ঐ সমস্ত প্রক্রিয়ায় সমর্থ হয়েছিলেন। প্রাগৈতিহাসিক মানুষ কেন করোটি ছিদ্র করত তার কোন কারণ অদ্যাবধি আমরা জানি না। কিন্তু পৃথিবীর নানাস্থান থেকে সংগৃহীত সছিদ্র করোটি আজও তৎকালীন মানুষের শল্যক্রিয়ার এক মূক সাক্ষ্য বহন করছে। পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম গোলার্ধের বহুস্থানে সছিদ্র করোটি পাওয়া গেছে। অবশ্য পূর্ব গোলার্ধের করোটিগুলি পশ্চিম গোলার্ধের করোটিগুলি থেকে প্রাচীনতর। সমঘর পরীক্ষার দ্বারা উক্ত তথ্য প্রমাণিত হয়েছে। ভারতের বুর্জাহোম ও হরপ্পাতে সংগৃহীত সছিদ্র করোটি দুটি য়ুরোপীয় করোটিগুলির সমসাময়িক (বাগচী, ৪)।

সুতরাং স্বতঃই প্রমাণিত হয় য়ুরোপ ও এশিয়ায় শল্যপ্রযুক্তি কলার উন্মেষ আগে হয়েছিল।

(১) প্রাগৈতিহাসিক করোটি ছিদ্রকরণ

নবপলীয় যুগ

নীলনদ, তিগ্রিস, অয়ফ্রাতিস নদী এবং সিন্ধুনদের অববাহিকায় সভ্যতা উন্মেষের আগে এবং খ্রীষ্টজন্মের ৫ থেকে ১০ হাজার বছর পূর্বে নবপলীয় যুগের মানুষেরা য়ুরোপের প্রান্তরে প্রান্তরে যাযাবরের মত ঘুরে বেড়াতেন। তারা মৃতদেহ কবরস্থ করতেন এবং কবরের উপর বড় বড় চ্যাপ্টা পাথর চাপা দিতেন। ঐ পাথরগুলিকে "ডোলমেন" নামে অভিহিত করা হয়। প্রাচীন মানুষেরা ঐ কবরের মধ্যে মৃতদেহ, মৃতের প্রিয় ব্যবহৃত দ্রব্যাদি ও খাদ্যশস্য সমাহিত করতেন। কেন না তারা হয়তো ভাবতেন যে মৃতের আত্মার

পরলোক যাত্রার সময় উক্ত দ্রব্যসামগ্রী উপযোগী হবে। কবরগুলির মধ্যস্থিত মৃতদেহ নানা অবস্থায় পাওয়া গেছে। কতকগুলির ক্ষেত্রে অস্থি, করোটি ইত্যাদি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে কিন্তু কতকগুলির ভিতর অবিকৃত অবস্থায় করোটি ও অস্থি পাওয়া গেছে।

১৭ থেকে ১৯ শতকের মধ্যে ফরাসী দেশে কতকগুলি প্রাগৈতিহাসিক সছিদ্র করোটি আবিষ্কৃত হয়েছিল। ঐ সমস্ত ছিদ্র আঘাতজনিত বলে প্রথমে অনুমান করা হত। প্রুনিয়েরেস (৫৯) নামক ফরাসী প্রত্নতাত্ত্বিক বলেছেন যে, ঐ ছিদ্রগুলি মানুষের কৃত (চিত্র নং ১)। ফরাসী দেশে লোজের নামক প্রাগৈতিহাসিক কবরের মধ্যে সছিদ্র করোটির সঙ্গে তাম্রনির্মিত শল্যযন্ত্রও এক স্থানে পাওয়া গেছে (মর্টন, ৫০)।

পাউল ব্রোকা (২১) নামক বিখ্যাত ফরাসী চিকিৎসক লিলে শহরের এক বৈজ্ঞানিক সমাবেশে ১২টি সছিদ্র করোটি দেখিয়েছিলেন। ঐ সমস্ত করোটির ছিদ্রগুলি সম্মুখ বা পশ্চাদ্দেশ অপেক্ষা পার্শ্বদেশেই বেশী ছিল। ছিদ্রগুলির পরিধি সামান্য কয়েক সেন্টিমিটার থেকে শুরু করে ১০—১৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল। কতকগুলি ছিদ্রের পরিধিতে নবাস্থি উন্মেষের লক্ষণও দেখা গিয়েছিল যা থেকে নিশ্চয়ই প্রমাণিত হয় যে উক্ত ছিদ্রকরণ জীবৎকালে করা হয়েছিল এবং ছিদ্রকরণ প্রক্রিয়ার পরেও ঐ মানুষেরা জীবিত ছিলেন। কেন ঐ ছিদ্রগুলি করা হত তার কারণ অজ্ঞাত। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে, করোটি ছিদ্র করে যে অস্থির টুকরো সংগ্রহ করা হত তা' দিয়ে তাবিজ ইত্যাদি জিনিষ প্রস্তুত করা হত।

প্রুনিয়েরেস (৫৯) কর্তৃক আবিষ্কৃত করোটিগুলি নবপলীয় যুগের ছিল কেননা সে যুগেই সর্বপ্রথম তাম্রনির্মিত অস্ত্রের ব্যবহার শুরু হয়েছিল। ঐ করোটিগুলির চেয়েও আরও পুরাতন কালের কয়েকটি সছিদ্র করোটি ফরাসী দেশের ওমেমর্ত নামক গ্রামের এক গুহার ভিতরে পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু সেখানে কোনও তামার শল্যযন্ত্র পাওয়া যায়নি।

নবপলীয় যুগের সছিদ্র করোটি ফরাসী দেশ ছাড়াও ভূমধ্যসাগরের পশ্চিম উপকূলবর্তী কয়েকস্থান, স্পেনদেশ, পর্তুগাল, ব্রিটেন, ডেনমার্ক, সুইডেন, পোল্যাণ্ড, ইতালী ও রুশদেশেও পাওয়া গিয়েছে।

সমগ্র ভারতে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান করে মাত্র দুটি সছিদ্র করোটি পাওয়া গিয়েছে, চিত্র নং ২ (ক), (খ)। উত্তর কাশ্মীরের বুর্জাহোম নামক স্থানে প্রথম

করোটিটি পাওয়া যায় এবং দ্বিতীয়টি পাওয়া যায় সিন্ধু অববাহিকার হরপ্পাতে। সমঘর পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে প্রথমটি প্রত্নপলীয় যুগের এবং দ্বিতীয়টি নবপলীয় যুগের। কিন্তু উক্ত করোটি দুটির সঙ্গে কোনও শল্য যন্ত্র পাওয়া যায়নি (বাগচী, ৭)। য়ুরোপীয় করোটি ছিদ্রকারীরা করোটির উপর প্রস্তরখণ্ড ঘর্ষণ করে অথবা বৃত্তাকারে ছোট ছোট প্রাথমিক ছিদ্র করে সে গুলিকে সংযোজিত করে বড় ছিদ্র করতেন। বর্তমানে সাধারণতঃ উক্ত দ্বিতীয় প্রথাই সমধিক প্রচলিত কিন্তু বর্তমানের যন্ত্রপাতি ধাতুনির্মিত এবং হস্তচালিত, বিদ্যুৎচালিত বা বাষ্পচালিত। উক্ত য়ুরোপীয়রা কখনও কখনও করাতের মত ধাতুনির্মিত যন্ত্র দিয়ে চতুষ্কোণ ছিদ্র করতেন। অনুমান করা যায় যে নবপলীয় যুগের আদিম শল্য-চিকিৎসক ছুঁচলো কঠিন শিলাখণ্ড বা আগ্নেয় প্রস্তরখণ্ড হাতের সাহায্যে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ছোট ছিদ্র করতেন। পরবর্তীকালে শক্ত তামার যন্ত্র দিয়েও ছিদ্র করা হত। অনেক সময় সুঁচালো পাথরের খণ্ড কাঠের ডাণ্ডার মাথায় বেঁধে ডাণ্ডাটি হাতের তালুর সাহায্যে ঘুরিয়ে ঘুরিয়েও ছিদ্র করা হত (চিত্র নং ৩)। জীবন্ত মানুষের শরীরের উক্ত আস্থরিক চিকিৎসা করবার সময় কিভাবে যে অবসাদন করা হত তা ভাবলেও আশ্চর্য হতে হয়। কেউ কেউ মনে করেন যে অস্ত্রোপচারের আগে রোগীকে মাদক দ্রব্য সেবন করান হত অথবা স্বল্পকালের জন্য গলধমনী দুটি অবরুদ্ধ করে মস্তিষ্কের রক্ত-সঞ্চালন সীমিত করে তাকে অজ্ঞান করা হত (চিত্র নং ৪)।

পৃথিবীতে সভ্যতার উন্মেষের উষাকালে এবং আদিম মানুষ কর্তৃক লিপি আবিষ্কারের বহু আগেই উক্ত করোটি ছিদ্রণ প্রথা প্রচলিত হয়েছে। সমঘর দ্বারা উক্ত প্রাচীন করোটির অংশসমূহ পরীক্ষা করে নিরূপিত হয়েছে যে ঐ সকল করোটি খ্রীষ্টজন্মের ৫ থেকে ১০ হাজার বছর আগেকার মানুষের।

প্রাচীন পেরুদেশীয় করোটি শল্য কলা

দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর পশ্চিম উপকূলে আণ্ডিজ পর্বতমালার পশ্চিমে পেরু দেশ অবস্থিত। পেরু দেশের আদিম মানুষেরা মঙ্গোলীয় "ইণ্ডিয়ান" বংশোদ্ভব। স্পেন দেশীয় অভিযাত্রীরা পেরু দেশ অধিকার করে সেখানে য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রবর্তন করেছিল। পেরু দেশের রাজধানী লিমা শহরের দক্ষিণের এক উপদ্বীপের বালুকাবেলায় বহু প্রাগৈতিহাসিক অস্থি ও কার্পাসজাত কাপড়ের টুকরা পাওয়া গিয়েছে। টেল্লো (বাগচী, ৫) নামক এক প্রত্নতাত্ত্বিক

১৯২৫ থেকে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ঐ উপদ্বীপ সংলগ্ন গুহার মধ্যে অনুসন্ধান চালিয়ে প্রাগৈতিহাসিক কার্পাস বস্ত্র ও পশমের বস্ত্র, মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ, ঝুড়ি, অস্থি ও পাথরের অস্ত্রাদি আবিষ্কার করে উক্ত উপদ্বীপবাসী প্রাচীন মানুষদের সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টি উন্মেষ করেছেন (ভাইস, ৭৪)। সমর্ঘর দ্বারা পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে উক্ত দ্রব্য সামগ্রী খৃষ্ট জন্মের মাত্র স্বল্প কয়েক সহস্র বৎসর পূর্বের। উক্ত গুহার মধ্যে বেশ কিছু বিকৃত ও সছিদ্র করোটিও পাওয়া গিয়েছে (চিত্র নং ৫)। আদিম পেরুবাসীরা নিশ্চয়ই অবসাদনা শাস্ত্র বা জীবাণু নিরোধন পদ্ধতি সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না। পণ্ডিত পার্দাল (৫৩) বলেছেন যে, আরাউকানোস গোষ্ঠীর আদিম পেরুবাসীরা "দাতুরা ফেককৃস" নামক এক প্রকার ধুতুরা জাতীয় গাছের রস খাইয়ে মানুষকে অজ্ঞান করতেন। তাঁরা জীবাণু নিরোধক সামগ্রীও ব্যবহার করতেন। পারাকাস নামক এক স্থানের বহু কবরে প্রচুর পারদ ঘটিত লবণ, সেঁকো বিষ ও তাম্রজাতীয় লবণ পাওয়া গিয়েছে। ঐ সমস্ত দ্রব্যের জীবাণু নিরোধক গুণ এখন সুবিদিত। অনুমান করা হয় যে উক্ত ঔষধাদি জলে অথবা তেলে গুলিয়ে অস্ত্রপচার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হত। ঐ সমস্ত কবরে প্রাপ্ত সছিদ্র করোটি সমূহে কোনও অস্থি প্রদাহ বা জীবাণু ঘটিত রোগের নিদর্শন পাওয়া যায়নি ; সুতরাং সহজেই অনুমেয় যে আদিম পেরু দেশীয় শল্য চিকিৎসকেরা নিশ্চয়ই জীবাণু নিরোধক রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহার করতেন (চিত্র নং ৬, ৭)।

টেম্‌কিন (ওয়াকার ৭২) এর মতে পেরুদেশীয় সছিদ্র করোটিতে অস্থি প্রদাহ না থাকার অপর কারণ যে পেরুদেশীয় শল্য চিকিৎসকেরা সৌর আলোকিত উন্মুক্ত স্থানে অস্ত্রপচার কার্য্য সমাধা করতেন এবং জীবাণুদুষ্ট ক্ষতে যন্ত্রাদি ব্যবহার করতেন না। পেরুদেশীয় শল্য চিকিৎসকেরা নানা রকম উদ্ভিদজাত তৈলও ক্ষতে ব্যবহার করতেন, যার মধ্যে দারুচিনি বল্কলের নির্যাস উল্লেখযোগ্য। দারুচিনি বল্কলজাত তৈল শক্তিশালী জীবাণু নিরোধক। পারাকাসের ইংকা কবরে কয়েকটি অভিনব যন্ত্রাদিও পাওয়া গিয়েছে। যার মধ্যে দুটি তাম্র নির্মিত ও একটি আগ্নেয়শিলা থেকে তৈরী।

এ সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে আমার সুহৃদ লিমা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নায়ু শল্য শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক ডঃ এস্তেবান রোকৃকা, ইংকা ও প্রাগ-ইংকা কবর থেকে সংগৃহীত যন্ত্র সামগ্রী দ্বারা করোটি ছিদ্রকরণ করে প্রমাণ করেছেন যে, উক্ত প্রাগৈতিহাসিক শল্য যন্ত্রাদিও আধুনিক যুগের যন্ত্রের মত বেশ কার্যকরী।

প্রাচীন তাম্র নির্মিত বাটালি দিয়ে পারাকাসের প্রায় ৯০ শতাংশ করোটিতে ছিদ্র করা হত। কি করে তারা অস্ত্রপচারের সময় রক্ত ক্ষরণ বন্ধ করতেন তা এখনও অজ্ঞাত। তবে মনে হয় যে তাঁরা আঙ্গুলের চাপ দিয়ে রক্ত ক্ষরণ বন্ধ করতেন অথবা মাথাকে বেষ্টন করে মোটা দড়ি বেঁধে রক্ত ক্ষরণ বন্ধ করতেন। আরও অনুমান করা হয় হয়তো তাঁরা কোনও উদ্ভিদজাত সংকোচক (অ্যাসট্রিন্‌জেণ্ট) পদার্থ দিয়ে রক্ত ক্ষরণ বন্ধ করতেন। পেরু দেশের আণ্ডিস্‌ পর্বতে "পুমাকুকু" নামক উদ্ভিদের রসের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে "ট্যানিক অম্ল" থাকে। ট্যানিক অম্লের রক্ত ক্ষরণ রোধকারী ও সংকোচক গুণের কথা আজ সর্বজন বিদিত। পারাকাসের কবরে হাড়ের তৈরী সূচও পাওয়া গিয়েছে এবং প্রচুর কার্পাসজাত সূতাও পাওয়া গিয়েছে। সুতরাং মনে করা স্বাভাবিক যে পারাকাসের শল্য চিকিৎসকেরা কার্পাসের সূতা দিয়ে অস্ত্রপচারের পর রোগীর চামড়া সেলাই করতেন অথবা ক্ষতের দুই পাড়ের লম্বা চুলে গেড়ো বেঁধেও ক্ষত বন্ধ করতে সমর্থ হতেন। ক্ষতের উপর কার্পাস তুলা বিছিয়ে কাপড়ের বন্ধনী দিয়ে বেঁধে দেওয়া হত। ঐ রকম ক্ষত বন্ধনী সমেতও কয়েকটি করোটি পাওয়া গিয়েছে (চিত্র নং ৮)। আবার কয়েকটি করোটিতে সোনা অথবা রূপোর পাত দিয়েও করোটির ছিদ্র চাপা দেওয়া হয়েছে।

সাধারণত: করোটির ছিদ্রগুলি গোলাকৃতি হত। গ্রানা ও তাঁর সহযোগীরা (৩৭) ১৯৪টি সছিদ্র করোটি পরীক্ষা করে ৪০ টিতে ত্রিকোণ, ২৬টিতে ডিম্বাকৃতি, ৬টিতে আয়তাকার, ৪টিতে বহুকোণী, ৩টিতে চতুষ্কোণ ও ২০টিতে অসম ছিদ্র দেখেছেন। ছিদ্রগুলি প্রধানতঃ ব্রহ্মতালু অথবা করোটির পার্শ্বদেশে অবস্থিত ছিল। ১৬১টি করোটিতে ছিদ্র ছিল বামপার্শ্বে, ৭১টিতে ছিল ডান দিকে এবং ৮৩টিতে ছিল উভয় দিকে। আমাদের ভারতে আবিষ্কৃত ২টি সছিদ্র করোটির মধ্যে একটিতে ছিদ্র ছিল ডানপার্শ্বে এবং অপরটিতে ছিদ্র ছিল বামপার্শ্বে। বহু ছিদ্র যুক্ত করোটিগুলি দেখে মনে হয় যে সব ছিদ্রগুলি এককালে করা হয় নি। অনেক ক্ষেত্রে ছিদ্রগুলি করোটিতে বাইরের স্তর পর্যন্ত ভেদ করেছে কিন্তু পুরোপুরি করোটির উভস্তর ভেদ করে নি। যেমনটি দেখা যায় ভারতের বুর্জাহোম-এ পাওয়া সছিদ্র করোটিতে। উক্ত করোটির ৯টি ছিদ্রের মধ্যে ৪টি অসম্পূর্ণ। নৃতাত্ত্বিক গবেষণা করে দেখা গিয়েছে যে ৬১.২ শতাংশ করোটি ছিল পুরুষের এবং ৩৮.৮ শতাংশ ছিল নারীর। ঐ সমস্ত রোগীদের মধ্যে অস্ত্রপচারের পর কতজনের যে মৃত্যু হত তা অনুমান করা খুব

কঠিন (চিত্র নং ৯)। তবে বহুছিদ্রের পরিধিতে নবাস্থির উন্মেষ দেখে মনে হয় মাত্র ১০-১৫ শতাংশ ব্যক্তির অস্ত্রপচারের অব্যবহিত পর মৃত্যু হত। পারাকাসের করোটি সংগ্রহগুলির মধ্যে আরও একটি অদ্ভুত বিষয় পরিলক্ষিত হয়েছে। কতকগুলি করোটি পাওয়া গিয়েছে যেগুলি ইচ্ছাকৃতভাবে কঠিন বাঁধন দিয়ে বিকৃত করা হয়েছিল। কয়েকটি শিশুর করোটি পাওয়া গিয়েছে সেগুলিতে অবিকৃত অবস্থায় বন্ধনী বাঁধা ছিল (চিত্র নং ১০)। সবাই জানেন যে, চীন দেশের সুন্দরীরা তাদের পা ছোট করবার জন্যে বাল্যকাল থেকে লোহার জুতো পরে থাকত। উপরিউক্ত করোটি বিকৃত করণও মনে হয় চীন দেশের মত অনুরূপ এক সুন্দরীকরণের প্রচলিত ব্যবস্থা বা ধর্মীয় ব্যবস্থা। ঐ রকম নৃশংসভাবে করোটিকে বিকৃত করে মস্তিষ্কের কোনও ক্ষতি হত কিনা একথা এখনও জানা যায় নি। কেন না ইংকারা কোনও লিখিত বিবরণী রেখে যান নি (আর্ল ও সহযোগীরা, ২৯)।

করোটি বিকৃত করণের বিষময় ফল হচ্ছে মৃগীরোগ একথা বর্তমানকালের বিজ্ঞানীরা মনে করেন কেন না জন্মগত করোটি সঙ্কোচন রোগ বা ক্রানিওষ্টেনোসিস্ হলে রোগী মৃগীরোগাক্রান্ত হয়। আমাদের দেশের রাজস্থানে হুন বংশোদ্ভব রাজপুতদের মধ্যে করোটি সংকোচন রোগের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব আছে (বাগচী, ৭)।

পেরুবাসীরা কেন করোটি ছিদ্রণ করতেন সে কথা নিয়ে সদাই জল্পনা কল্পনা করা হয়। মনে করা হয় যে মস্তকে আঘাতপ্রাপ্ত রোগী, শিরঃপীড়া (মাইগ্রেন), মৃগীরোগ ও চক্ষুরোগের নিরাময়ের জন্য করোটিতে ছিদ্র করা হত। জিগেরিস্ত (৬৩) বলেছেন যে, ছিদ্রকরণ জীবিত ও মৃত উভয়ের উপরই করা হত। মৃতের করোটি থেকে বৃত্তাকার অস্থির অংশ কেটে ও মাঝে ফুটো করে তাবিজ বা কণ্ঠহার তৈরী করা হত। আরও অনুমিত হয় যে, করোটি ছিদ্রণের পর জীবিত রোগ রোগীর যথাকালে মৃত্যুর পর তার করোটির অংশ দীর্ঘ জীবন লাভের ও রোগ প্রতিষেধের তাবিজ হিসাবে ব্যবহৃত হত। অনেকে মনে করেন যে, ছিদ্রকরণ এক ধর্মীয় আচার ছাড়া আর কিছুই নয়। অত্যন্ত অধিক সংখ্যক সছিদ্র পেরুদেশীয় করোটি থেকে উক্ত অনুমান করা হয়েছে। ব্রোকা (২১) বলেছেন যে, করোটি ছিদ্রণ নিছক ধর্মীয় আচার।

প্রাচীন মানুষের মস্তকে শল্য চিকিৎসা মানুষের সাহসিকতার এক

প্রাচীনতম নিদর্শন। উক্ত অস্ত্রপচারের পদ্ধতি থেকে পরবর্তীকালের মস্তিষ্ক শল্য চিকিৎসাশাস্ত্রের উদ্ভব এ কথাও অনেকে স্বীকার করেন না। পরবর্তীকালে তুরপুন যন্ত্র প্রয়োগে করোটিতে অস্ত্রপচার প্রাগৈতিহাসিক ছিদ্রকরণ থেকে অনেক উন্নত প্রযুক্তি শৈলীর পরিচায়ক।

পরবর্তীকালেও য়ুরোপ, এশিয়া, দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের বহু দ্বীপ এবং আমেরিকাতেও আদিম ধর্মীয় রীতি অনুসারে করোটিতে ছিদ্র করা হত।

(২) ছিদ্রক যন্ত্র সাহায্যে করোটি ছিদ্রকরণের অধ্যায় (ট্রেপানেসান)

প্রাচীন স্নায়ুশল্য চিকিৎসায় ব্যবহৃত ছিদ্রকের সাহায্যে করোটির বৃত্তাকার অংশ ছেদন করা যায়। কে যে যন্ত্রটির উদ্ভাবক সে কথা এখনও অজ্ঞাত। পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রের জনক ইপ্পোক্রাতেস (৪০) তাঁর এক পুস্তকে ছিদ্রক ব্যবহারের বিশেষ বিধিব্যবস্থার নির্দেশনামা দিয়েছেন। ইপ্পোক্রাতেস-এর পরবর্তীকালে গ্যালেন এর মতানুগ ছিদ্রক চালনা করার কৌশল মাত্র কয়েক শতাব্দী আগে পর্যন্তও অনুসরণ করা হত (চিত্র ১১)।

প্রাচীন গ্রীসের করোটি ছিদ্রণের ধাতু নির্মিত ছিদ্রক যন্ত্র প্রাগৈতিহাসিক যুগের আগ্নেয়শিলা নির্মিত যন্ত্রের মত দুই হাতের তালুর সাহায্যে ঘুরিয়ে চালনা করা হত। কোন কোন যন্ত্র বর্তমান কালে সূত্রধরদের ব্যবহৃত ছিদ্রক যন্ত্রের মত একটি রজ্জু ও কাঠের দণ্ড দিয়ে ঘোরান হত। কোনও কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে সরু ছিদ্রকের সাহায্যে বৃত্তাকারভাবে অনেকগুলি ছোট ছিদ্র করে সেই ছিদ্রগুলি এক প্রকার করাতের সাহায্যে সংযোজিত করা হত এবং করোটির বেশ কিছু অংশ অপসারিত করা হত। কেবলমাত্র করাতের সাহায্যেও আয়তাকার অথবা চতুষ্কোণ ছিদ্র করা হত। কালক্রমে ছিদ্রকযন্ত্র ও করাতের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল। ১৬শ শতকে করোটি ছিদ্রকরণের একটি যন্ত্র ফরাসী শল্য চিকিৎসক আঁব্রয়ে পারে (৫৭) কর্তৃক উদ্ভাবিত হয়েছিল। যন্ত্রটি কতকটা জ্যামিতি পাঠের কাঁটা-কম্পাস যন্ত্রের মত দেখতে ছিল। বিগত শতকের বিখ্যাত ইংরাজ শল্য চিকিৎসক স্যর হেনরী স্যটার অনুরূপ একটি উন্নত ধরনের ছিদ্রক উদ্ভাবন করেছিলেন। কোনও কোনও ঐতিহাসিক-এর মতে অ্যাকুয়াপেন্দেন্তে নগরীর ফাব্রিসিউস নামক শল্য চিকিৎসক বৃত্তকরাত

(ক্রাউন ট্রেফাইন) যন্ত্রের উদ্ভাবক। যন্ত্রটিকে লাতিন ভাষায় "ট্রেফাইন" বলা হয়। আঘাতের ফলে অনেক সময় ভগ্ন করোটির অংশ কয়োটির ভিতর প্রবেশ করে মস্তিষ্কের দৃঢ় আবরণী (ডুরা-দৃঢ়) ও মস্তিষ্কের ক্ষতি সাধন করে।

ঐ সমস্ত ভগ্নাংশ উত্তোলন করবার জন্য এক ত্রিপদী যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছিল। লাতিন ভাষায় যন্ত্রটির নাম ছিল "ত্রিপ্লয়দেস" বা "ত্রিপেস্" (চিত্র ১২)। যন্ত্রপাতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শল্য চিকিৎসকেরা সাহসিকতার সঙ্গে দুরুহ অস্ত্রপচার আরম্ভ করেন। কালক্রমে বিশেষ অস্ত্রপচার কক্ষ নির্মিত হয় এবং অস্ত্রপচারের বিশেষ মেজও তৈরী করা হয়।

তৎকালীন শল্য চিকিৎসকেরা মাথায় আঘাত জনিত রোগ, মস্তিষ্কোদক ও মৃগী রোগের চিকিৎসার জন্য করোটিতে ছিদ্র করতেন।

মস্তিষ্কোদক রোগ ঃ (হাইড্রোকেফালস) নিরাময়ের জন্য প্রাচীন শল্য চিকিৎসকেরা খুব সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু তাঁদের প্রচেষ্টা নৈরাশ্যজনক ছিল। সেল্সুস এবং তাঁর পরবর্তীকালের চিকিৎসকগণ রোগাক্রান্ত শিশুর মাথায় ছিদ্র করে বদ্ধ জল নিষ্কাশন করে দিতেন। ফালেপিয়ুস লিখে গিয়েছেন যে জল নিষ্কাশন করা সত্ত্বেও শিশুর মৃত্যু অবধারিত ছিল। পারে (৫৭) চারটি মস্তিষ্কোদকগ্রস্ত রোগী দেখেছিলেন যারা সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল।

মৃগীরোগ ঃ চিকিৎসাশাস্ত্রের আরম্ভের সূচনা থেকেই মৃগীরোগের চিকিৎসায় করোটি ছিদ্রকরণ চালু হয়েছে। ইপ্পোক্রাতেস (৪০) একটি রোগীর ইতিহাসে লিখে গিয়েছেন যে রোগীকে মৃগীরোগের জন্য করোটি ছিদ্রণের ফলে তার মৃত্যু হয়েছিল। সেলসুস্ (২৪) আরিটেইউস্ (২) আউরেলিয়ানুস (৩) এবং অন্যান্য প্রাচীন চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা মৃগীর চিকিৎসায় করোটি ছিদ্রণ ও অগ্নি আরোপণ (কটারাইজেসান) চিকিৎসা অনুমোদন করতেন। কালে কালে করোটি ছিদ্রণ বহুল প্রচলিত হয়েছিল। চিকিৎসকেরা সর্বদাই অভিমত প্রকাশ করতেন যে, উক্ত চিকিৎসার দ্বারা মস্তকের ভিতর থেকে দূষিত বায়ু ও রস বের হয়ে যায় এবং উচ্চ চাপ প্রশমিত হয়। বেরেন্গারিউস্-এর (১৩) বর্ণনা থেকে জানা যায় যে তিনি একটি রোগীর করোটি ছিদ্র করে রোগীটিকে নিম্নমুখী করে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। প্রক্রিয়াটির ফলে রোগীর মস্তক থেকে দুধের মত সাদা রস নির্গমিত হয়েছিল। হয় তো রোগীর মস্তকে আবদ্ধ পূঁজ ছিল ?

মস্তকে আঘাত ঃ মস্তকে আঘাতের চিকিৎসাতেই করোটি ছিদ্রণ

সর্বাধিক প্রচলিত ছিল। ব্রেষ্টেড (১৯) কর্তৃক ব্যাখ্যাকৃত মিশরীয় "এড্‌উইন স্মিথ্ ভূর্জপত্র" লিখনে বহু মস্তকে আঘাত প্রাপ্ত রোগীর রোগ বিবরণ আছে। উক্ত লিখনে বিবৃত আছে যে মস্তিষ্কে আঘাত প্রাপ্ত হলে মৃত্যু অবধারিত। কিন্তু মস্তকের সাধারণ আঘাত চিকিৎসাযোগ্য এবং তা থেকে আরোগ্য লাভও আশাপ্রদ। মস্তকে আঘাত সম্বন্ধে ইপ্পোক্রাতেস (৪০) অতি জ্ঞানগর্ভ বিবরণ লিখে গিয়েছেন। তিনি উক্ত আঘাতজনিত অবস্থা পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেছেন এবং বলেছেন যে করোটির অস্থি-ভগ্নাংশ করোটির অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হলে (ডিপ্রেসড্ ফ্র্যাক্‌চারস্) সেগুলিকে অবিলম্বে অস্ত্রপচার করে বের করে ফেলা বিধেয় নতুবা প্রাণহানির আশঙ্কা অতি প্রবল। তিনি আরও বলেছেন যে, করোটিতে ছিদ্র করতে হলে করোটির বিভিন্ন অস্থি সঙ্গম (স্যুচারস) থেকে দূরে থাকতে হবে নতুবা আভ্যন্তরীণ শিরা ও ধমনীতে আঘাত অনিবার্য। তুরপুন যন্ত্রটি ছিদ্রকরণের কালে বারবার জল দিয়ে সিক্ত করে শীতল করতে হবে নতুবা অস্থি দাহিত হতে পারে। এ বিধি অত্যন্ত বিজ্ঞান ভিত্তিক এবং আজও সুপ্রচলিত। বর্তমান কালের মত তিনিও বলেছেন যে সন্দেহ হলেই মস্তকে আঘাত প্রাপ্ত রোগীর করোটিতে ছিদ্র করা উচিত কেন না তাহা হলে আভ্যন্তরীণ অনেক গলদ ধরা যাবে। আজ দুই সহস্র বছর পরে অত্যাধুনিক যুগেও ঐ বিধি "বীক্ষণ ছিদ্র" বা "ইনস্‌পেক্‌সন্ বার-হোল" নামে পরিচিত। সেলস্যুস (২৪), গ্যালেন (৩২), পল অব এজিনা (৫৮) এবং আরও অনেকে ইপ্পোক্রাতেস-এর অনুশাসন মেনে চলতেন। বিখ্যাত মূর চিকিৎসক রাহ্‌জেস্ বা আররাজি (৮০) বলতেন যে করোটির অভ্যন্তরে উচ্চচাপের সৃষ্টি প্রাণহানিকর। সমকালীন আরও অনেক আরবী চিকিৎসকেরা অবহেলা করে করোটি ছিদ্রণ প্রক্রিয়া বিস্মৃত হয়েছিলেন। সালের্নো নগরীর চিকিৎসা বিদ্যালয়ের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আবার গ্রীক চিকিৎসকদের প্রথার পুনরুন্মেষ হয়। পাশ্চাত্য শল্য চিকিৎসা বিদ্যার দিক্‌পাল গী দ্য শাউলিয়াক্ (৩২), এজিনার পল-এর মতবাদ এর অনুগামী ছিলেন।

মাঝে মাঝে কোনও কোনও নব্য চিকিৎসকেরা অজ্ঞতাবশতঃ প্রাচীন পণ্ডিতদের মতের বিরুদ্ধাচরণ করতেন। সেই সকল পণ্ডিতগণ কতৃক দৃষ্ট রোগলক্ষণসমূহ এবং তার বর্ণনা আজও অনবদ্য। থেয়োডোরিক (৯৫) ক্ষত থেকে পূঁজ নিঃসরণের উপর কোনও গুরুত্ব দিতেন না। কিন্তু তাঁর সময়েও পূঁজ নিঃসরণ ক্ষতের আরোগ্য লক্ষণ রূপে পরিগণিত হত (চিত্র নং ১৩)।

বেরেনগারিউস (১৩) ইপ্পোক্রাতেস ও গ্যালেন এর অনুশাসন অমান্য করে করোটির যত্র তত্র ছিদ্র করতেন এবং বিষময় ফলও লাভ করেছিলেন। প্রখ্যাত বেলজীয় শারীরস্থানবিদ্ ভেসালিউস (৬৮) করোটিতে একটি ছিদ্র করে পূঁজ বের করেছিলেন। আঁব্রয়ে পারেও (৫৭) অনুরূপ এক অস্ত্রপচারে সফলতা লাভ করেছিলেন। এক শতাব্দী পরে গ্লানডরপ্ করোটির অভ্যন্তরে আবদ্ধ দূষিত রক্ত অপসারণ করে এক রোগীকে সুস্থ করে ছিলেন। যদিও ইপ্পোক্রাতেস (৪০) বলতেন যে আঘাত জনিত মস্তিষ্কের ক্ষত প্রাণ-হানিকর, তথাপি গ্যালেন (৩২) বলেছেন যে, তিনি ঐ প্রকার আঘাতে রোগারোগ্যও দেখেছেন। ব্রুনুস্ (২৩) বলেছেন যে, মস্তিষ্কের নিলয়ের (ভেন্ট্রিকল্স্) আঘাত গুরুতর। কিন্তু থিয়োডোরিক (৬৭), দে মদেভিল্লে (২৭) ও পারে (৫৭) অনুরূপ আঘাতগ্রস্ত রোগীদেরও বাঁচতে দেখেছেন। ইয়োঙ্গে (৭৬) এর গবেষণায় দেখা যায় যে, গ্যালেন এর পূর্ববর্তী ১৫০০ বৎসর কালের মধ্যে কেবল মাত্র ১০০ রোগী মস্তিষ্কের নিলয়ের আঘাত সত্ত্বেও সুস্থ হয়েছিল। শিক্ষাগুরুদের আদেশে ১৮ ও ১৯ শতকেও করোটি ছিদ্রণ বহুল প্রচলিত ছিল কেন না তৎকালীন নিদানতাত্ত্বিকেরা বিশেষ বিবেচনা না করে যে কোনও মস্তকে আঘাত প্রাপ্ত রোগীর করোটি ছিদ্রণের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। ক্রমে ক্রমে উক্ত অস্ত্রপচারের নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ এবং যুক্তিসঙ্গত করা হল। লণ্ডনের গাইস হাসপাতালের ব্যালান্স (১০) লিখে গিয়েছেন যে. ১৮৬৯ থেকে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যকালে সেখানে ৫১টি রোগীর করোটি ছিদ্রণ করা হয় কিন্তু তন্মধ্যে মাত্র ১২ জন অস্ত্রপচারের পর জীবিত ছিলেন। অনুরূপ আশঙ্কার কারণেই বহু শল্য চিকিৎসক উক্ত প্রক্রিয়ায় বিরত হতেন।

প্রাচ্যের করোটি ছিদ্রণ

প্রতীচ্যের ন্যায় প্রাচ্যেও বহু সছিদ্র করোটি পাওয়া গিয়েছে কিন্তু সংখ্যানুপাতে তা প্রতীচ্যের অপেক্ষা অনেক কম। ব্রাউন (২২) এক পুরাতন পারসিক পাণ্ডুলিপির মধ্যে সরবাৎ বা সর্নাম নামক এক ভারতীয় চিকিৎসকের উল্লেখ দেখেছেন। যিনি আরিষ্টট্ল্-এর সান্নিধ্যে এসেছিলেন এবং তিনি অ্যারিষ্টটলের সহযোগিতায় এক রোগীর করোটি ছিদ্র করেছিলেন।

প্রাচীন চীনদেশেও খৃষ্টজন্মের অব্যবহিত পরবর্তীকালে করোটি ছিদ্রণ করা হত। নীড্হাম (৫১) বলেছেন যে, দা-চিউ নামক স্থানের বিচক্ষণ

চিকিৎসকেরা করোটির অংশবিশেষ অপসারণ করে "মিউ সাং" রোগের কীট বের করতে সফল হয়েছিলেন। ইপ্পোক্রাতেস (৫০)-এর লিখনেও অনুরূপ এক বিচিত্র বিবরণ আছে।

ব্রিউইট্-টেইলার (২০) লিখেছেন যে, চীনদেশের শল্য চিকিৎসার দেবতা "হুয়া" এক ব্যক্তির দুই চোখের মধ্যবর্তী একটি অর্বুদের মধ্য থেকে শল্য চিকিৎসার দ্বারা একটি ছোট পাখী বের করে রোগীকে আরোগ্য করেছিলেন! আর এক চৈনিক কাহিনীতে লেখা আছে "ৎজো-ৎজে" নামধেয় এক বিখ্যাত চৈনিক সৈন্যাধ্যক্ষ প্রায়ই শিরঃপীড়ায় ভুগতেন। তিনিও উপরিউক্ত শল্য চিকিৎসার দেবতা "হুয়া"-র শরণাপন্ন হন। পরীক্ষা নিরীক্ষার পর হুয়া বলেন যে, সৈন্যাধ্যক্ষের মস্তিষ্কে একটি অর্বুদ গজিয়েছে। অতঃপর তিনি রোগীকে ভাঙ্গের রস খাইয়ে অজ্ঞান করেন এবং অর্বুদটি অপসারণ করে রোগীকে রোগমুক্ত করেন। সমকালীন চীনের সম্রাট "হুয়া"-র অলৌকিক ক্ষমতা দেখে ঈর্ষান্বিত হয়ে তাঁকে কারারুদ্ধ করেন ও শারীরিক অত্যাচার করে বধ করেন। কথিত আছে যে, মৃত্যুর পূর্বে হুয়া তাঁর প্রায় সমস্ত পুঁথি ও পত্রাদি পুড়িয়ে নষ্ট করে ফেলেছিলেন। হুয়া কর্তৃক ১৭০০ বৎসর আগে অবচেতনা করণের পদ্ধতি উদ্ভাবিত হওয়া সত্ত্বেও চীনদেশীয় শল্যশাস্ত্রের ক্রম অবনতি ঘটেছিল কেন না কনফুসীয় পণ্ডিতেরা মানুষের শরীরের উপর অস্ত্রোপচারকে অধর্মীয় ও অপবিত্র মনে করতেন এবং বলতেন যে, অস্ত্রোপচারের দ্বারা শরীরের অংশ ছেদন করলে মৃতের স্বর্গারোহণ ব্যাহত হয়।

ভারতের কথা ও কাহিনীতে কদাচিৎ মস্তকে শল্য-চিকিৎসার উল্লেখ দেখা যায়। ধার রাজ্যের রাজা ভোজ সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে বল্লাল লিখেছেন যে, ভোজ রাজা এক অজ্ঞাত মস্তকের রোগে আক্লিষ্ট হয়েছিলেন। কথিত আছে যে, তাঁর মস্তকের মধ্যে "সফর" বা মাগুর মাছ ঢুকেছিল। কোনও চিকিৎসায় ফল না পাওয়ায় অবশেষে তিনি দেবরাজ ইন্দ্রের শরণাপন্ন হন। দয়াপরবশ হয়ে ইন্দ্র দেবতাদের চিকিৎসক অশ্বিনীকুমার ভ্রাতৃদ্বয়কে পাঠিয়ে দেন। তাঁরা ভোজকে "সম্মোহিনী" নামক ভেষজ দ্বারা অজ্ঞান করে তার মাথার মধ্য থেকে সফরটি বের করে ভোজ রাজাকে রোগমুক্ত করেন এবং "সঞ্জীবনী" নামক ভেষজ প্রয়োগে পুনরায় রোগীর জ্ঞানোন্মেষ করেছিলেন।

(৩) বর্তমানের স্নায়ু শল্য-চিকিৎসা

মাথার মধ্যে থেকে কাল্পনিক ভূত বা দৈত্য দানব বিতাড়নের জন্য

প্রাগৈতিহাসিক মানুষ করোটিতে যে ছিদ্র করতেন তার একমাত্র কারণ তাদের স্নায়ুতন্ত্র, মস্তিষ্ক ইত্যাদির ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে অজ্ঞতা। সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধি পেতে লাগলো এবং মানুষ ক্রমে ক্রমে শারীরস্থান বিদ্যা, দেহবিজ্ঞান ও নিদানতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান সমৃদ্ধ হল। উক্ত উন্নতি হতে বেশ কয়েক শতাব্দী সময় লেগেছিল। বেলজিয়াম দেশের লুভেঁ শহরের প্রখ্যাত শারীরস্থানবিদ ভেসালিউস (৬৮), গ্যালেন প্রবর্তিত শারীরস্থান জ্ঞানের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে প্রথম সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। পারে (৫৭) এবং উইলিস (৭৫) ভেসালিউসের মতবাদের অনুগামী হয়ে অন্যান্য সমসাময়িক শারীর বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। যখন শব ব্যবচ্ছেদের প্রথা চালু হল তখন অতি সহজেই শারীরস্থানবিদ্‌রা শরীরের বহিস্নায়ু রজ্জু সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করলেন।

কিন্তু স্টেনসেন (৬৬) নামক দিনেমার শারীরস্থানবিদ বলেছেন যে মস্তিষ্কের অভ্যন্তরস্থ সূক্ষ্ম স্নায়ুরজ্জুসমূহ ব্যবচ্ছেদ করা সেইসময় প্রায় দুঃসাধ্য ছিল কেন না উক্ত স্নায়ুরজ্জুগুলিকে সাধারণের দৃষ্টিগোচর করবার কোনও উপায় জানা ছিল না। ১৮ শতকে ভিক্‌ দ্য জার (৬৯) সর্বপ্রথম সুরাসার ও সোরার এক মিশ্রণের মধ্যে মৃত ব্যক্তির মস্তিষ্ক ডুবিয়ে রেখে মস্তিষ্ককে শক্ত করে ব্যবচ্ছেদের সুবিধা করেন। তাঁর পরবর্তীকালে আরও ঔষধ বেরিয়েছিল এবং ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ব্লুম (১৫) নামক জার্মান বৈজ্ঞানিক সর্বপ্রথম শারীরস্থান শাস্ত্রবিদ্যায় "ফর্মালিন" নামক রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারের প্রথা প্রবর্তন করেন এবং আজও উক্ত প্রথা প্রচলিত আছে।

অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে স্নায়ুতন্ত্রের বীক্ষণ আরম্ভ হয়েছিল উনিশ শতকে। উনিশ শতকের প্রায় মধ্যবর্তীকাল থেকে রঞ্জক পদার্থের সাহায্যে স্নায়ুতন্ত্রকে রঞ্জিত করে অণুবীক্ষণ পরীক্ষা শুরু হয়। গেরলাখ (৩৪) সর্বপ্রথম 'কারমিন' নামক রঞ্জক পদার্থের ব্যবহার আরম্ভ করেন। হ্বালডেইয়ের (৭১) "হিমাটক্সিলিন" নামক রঞ্জক দ্বারা স্নায়ুতন্ত্র রঞ্জনে সমর্থ হন। তাঁর রঞ্জনবিধি ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে হ্বাইগের্ট (৭৩) কর্তৃক আরও উন্নীত হয়। প্রায় সমকালে ইতালীয় নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী কামিলো গোল্‌গি (৩৬) রৌপ্যঘটিত "সিলভার নাইট্রেট" নামক লবণের দ্রাবণ দিয়ে স্নায়ুতন্ত্রও রঞ্জিত করতে আরম্ভ করেন। পরবর্তীকালে নিস্‌ল্‌ (৫২), মার্চি এবং আলজেরি (৪৮) রঞ্জনের নূতন নূতন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন। হ্বালডেইয়ের (৭১)

কর্তৃক সর্বপ্রথম স্নায়ুকোষতত্ত্ববাদের (নিউরোন থিয়োরী) মতবাদ প্রবর্তিত হয়েছিল।

স্নায়ুতত্ত্ব বিজ্ঞানের উন্মেষ

স্নায়ু-শারীরস্থান শাস্ত্রের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে স্নায়ুতন্তর কার্যকারিতা সম্বন্ধে মানুষের কৌতূহল বাড়তে লাগল। ১৮ শতকের মানুষের ধারণা হল যে, দৃষ্টি, শ্রবণ, আঘ্রাণ, ক্ষুধা এবং স্পর্শবোধ মস্তিষ্কের মাধ্যমে বোঝা যায়। মস্তিষ্কের নামকরণ করা হল "সেন্সোরিউম কম্উনে" অর্থাৎ "সাধারণ অনুভূতি কেন্দ্র"। কিন্তু মস্তিষ্কের ঠিক কোন স্থানে কোন বোধের কেন্দ্র অবস্থিত সে সম্বন্ধে প্রচুর মতানৈক্য ছিল। মস্তিষ্ক নিলয়, মস্তিষ্ক দণ্ড (ব্রেইনষ্টেম্), মস্তিষ্ক যোজক (করপাস ক্যালোসাম্) অথবা মস্তিষ্কের শ্বেতাংশ (হোয়াইট ম্যাটার) অনুভূতির কেন্দ্র বলে ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিতেরা মনে করতেন। সুইজারল্যাণ্ডের বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত আল্‌ব্রেখ্‌ট্‌ ফন্ হাল্লের মস্তিষ্কের শ্বেতাংশকেই অনুভূতির কেন্দ্র বলে মনে করতেন। ফরাসী নিদানতাত্ত্বিক বিশাট্‌ (১৪) বলতেন যে, যকৃৎ, প্লীহা ও অপরাপর যন্ত্রের মধ্যে মানুষের আবেগ সঞ্চিত থাকে। জার্মাণ পণ্ডিত স্মোম্মেরিং (৬৫) শব ব্যবচ্ছেদ করে দেখে ছিলেন যে মস্তিষ্কোদ্ভূত স্নায়ুরজ্জু (ক্রেনিয়েল নার্ভস্) মস্তিষ্ক রস (সেরিব্রো স্পাইনাল ফ্লুয়িড) দ্বারা সিক্ত হয়। সুতরাং তিনি অবতারণা করলেন যে মস্তিষ্ক রসের মাধ্যমেই স্নায়ুরজ্জুর কার্য সম্পন্ন হয়।

উপরিউক্ত আধা দার্শনিক মতবাদ সমূহ ১৯ শতকের প্রথমভাগ পর্যন্ত বেশ প্রচলিত ছিল। ফ্রানৎস্ যোশেফ্‌ গাল্‌ এবং তাঁর শিষ্য স্পুরৎজহাইম্ (৩৩) "ফ্রেনোলজি' বা "মনতত্ত্ব' নামক এক অভিনব মতবাদএর প্রবর্তন করে বেশ কিছুকাল বাজার গরম করে রেখেছিলেন। তাঁরা মৃত মানুষের করোটির উপর নানা রকম হিজি বিজি নকসা কেটে মানচিত্রের মত বিশেষ বিশেষ এলাকায় বিশেষ বিশেষ অনুভূতি নিবদ্ধ থাকে বলে দাবী করতেন (চিত্র নং ১৪)। ফ্লুরেন্স (৩০) এর গবেষণায় গাল্‌ ও তাঁর সহযোগীর দাবী অযৌক্তিক প্রতিপন্ন হয়। তিনি একটি জীবন্ত কুকুরের মস্তিষ্কের পশ্চাত ভাগ অনাবৃত করে মস্তিষ্ক দণ্ডে সাবধানে খোঁচা দিয়ে বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পেশী সঞ্চালিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অতঃপর তিনি মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ সাবধানে ছেদন করে শরীরের বিভিন্ন পেশীর কর্মক্ষমতা হরণ করতেও কৃতকার্য হন।

বর্তমান পৃথিবীর সর্বপ্রথম "স্নায়ু পরীক্ষক বিজ্ঞানী" বা একস্পেরিমেণ্টাল নিউরোফিজিওলজিষ্ট বলতে তাঁকেই অভিহিত করা যায়।

বিদ্যুৎতরঙ্গ দ্বারা মস্তিস্কের কার্যানুসন্ধান সর্বপ্রথম করেছিলেন লুইজি রোল্যাণ্ডো (৬১) নামক এক ইতালীয় বিজ্ঞানী। মস্তিষ্কের প্রধান পেশী সঞ্চালন কেন্দ্র (মোটর এরিয়া) আজও তাঁর নামের স্মরণে "রোল্যাণ্ডিক্ এরিয়া" বা রোল্যাণ্ডের এলাকা নামে সুপরিচিত।

১৮২৫ খৃষ্টাব্দে বুইলাউদ (১৬) নামক এক স্নায়ুবিজ্ঞানী এক প্রবন্ধে লিখেছিলেন যে, মস্তিষ্কের পুরোভাগে আঘাত লাগলে বাক্যহানি হয়। দাকস্ (২৭) আরও গবেষণা করে স্থির করেন যে, সাধারণতঃ দক্ষিণ হস্ত ব্যবহারকারী মানুষের বাচনের স্নায়ুকেন্দ্র মস্তিষ্কের বামদিকের পুরোভাগে অস্থিত। পরবর্তী-কালে পাউল ব্রোকা (২১) প্যারী সহরের নৃতত্ত্ব সংস্থার এক অধিবেশনে উক্ত বিষয়ে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা প্রসূত এক জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দিয়ে বুইলাউদ্ ও দাকস্ উভয়ের মতবাদকে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। ব্রোকার স্মৃতি স্মরণে মস্তিষ্কের বামদিকের পুরোভাগে অবস্থিত বাচন স্নায়ুকেন্দ্রটি "ব্রোকার কেন্দ্র" বা ব্রোকাস সেণ্টার নামে আজও পরিচিত। ব্রাভিস (১৮) নামক এক ব্যক্তি সর্বপ্রথম "কেন্দ্রিক মৃগী" বা ফোকাল এপিলেপ্‌সি রোগ নির্ণয় করেছিলেন। কিন্তু কালক্রমে ইংরাজ চিকিৎসক জ্যাকৃসন (৫৮) উক্ত কৃতিত্বের সুনামধারী হলেন কেন না তিনি কেন্দ্রিক মৃগী রোগের উপর আরও প্রচুর গবেষণা করেছিলেন। ফ্রিৎস্ ও হিৎজিগ্ (৪০) নামক দুই জার্মাণ বিজ্ঞানী পরীক্ষা-মূলকভাবে মস্তিষ্কের অঙ্গচালক কেন্দ্র বিদ্যুৎ তরঙ্গের সাহায্যে উত্তেজিত করে বহু তথ্য লিখে রেখে গিয়েছেন। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে বার্থোলো (১১) নামক মার্কিন অধ্যাপক চিকিৎসক উক্ত পরীক্ষার আরও উন্নততর উপায় উদ্ভাবন করেছিলেন। সংক্ষেপে, গবেষণামূলক স্নায়ুবিজ্ঞানের উন্মেষের ইতিহাসে পূর্বোক্ত ব্যক্তিগণই প্রকৃত পথদ্রষ্টা (চিত্র নং ১৫ ও ১৬)।

নিরীক্ষামূলক স্নায়ুতন্ত্রের সূচনা

(ক্লিনিক্যাল নিউরোলজী)

ইহা অতি সত্য যে, কোনও রোগীকে চিকিৎসার পূর্বে সঠিক রোগ নিরুপণ না করতে পারলে চিকিৎসায় বিঘ্ন ঘটে। ভেষজ চিকিৎসার অনুপাতে শল্য চিকিৎসায় উহা অবশ্য প্রয়োজনীয়।

সুতরাং স্নায়ু শল্যচিকিৎসার পূর্বে নিরীক্ষার দ্বারা সঠিক রোগ নিরূপণ এক অতি অবশ্য কর্তব্য। মরগ্যান্নি (৪৯) সর্বপ্রথম নিরীক্ষামূলক ভাবে নির্ণিত রোগ লক্ষণ প্রমাণ করবার জন্য শব ব্যবচ্ছেদের প্রথা প্রবর্তন করেন এবং বহু রোগ ও "রোগ লক্ষণ সমষ্টি" (সিন্‌ড্রোম) লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। ১৯০০ শতকে জার্মাণ চিকিৎসকেরা অনুরূপভাবে আরও গবেষণা চালিয়ে পরবর্তীকালের "স্নায়ুনিদান তত্ত্ব" বা নিউরোপ্যাথলজী শাস্ত্রের গোড়াপত্তন করেছেন। অজ্ঞাত স্নায়ুরোগে রোগীর মৃত্যু হলে সেই মৃতদেহের শবব্যবচ্ছেদ কড়া ছাড়া প্রাচীনকালে মৃত্যুর কারণ সঠিক নির্ণয়ের কোনও উপায় ছিল না। আঁদ্রাল্ (১) নামক প্যারী সহরের এক অধ্যাপক চিকিৎসক সর্বপ্রথম রোগ লক্ষণ ও সেই রোগীর মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ থেকে লব্ধ শরীরের আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন সমূহের সমন্বয়ের উপর এক জ্ঞানগর্ভ পুস্তক লিখেছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম ব্যক্ত করেন যে স্নায়ুতন্তুর বিশেষ বিশেষ স্থানে রোগ হলে বিশেষ বিশেষ ধরনের রোগ লক্ষণ হয়। জার্মাণ কবি ও দার্শনিক গ্যেটে বলেছিলেন যে, "হ্বাস্ ম্যান্ হবাইস্ সীথ মান" অর্থাৎ মানুষ যা জানে তাই চোখে দেখতে পায়। এই মূল্যমান উক্তি নিদানতত্ত্বের সঙ্গে রোগ লক্ষণ তত্ত্বের সমন্বয়ের এক জাজ্বল্যমান উদাহরণ।

জীবাণু নিরোধনদ্বারা শল্য চিকিৎসার প্রগতি

জীবাণু নিরোধক জ্ঞানের অভাবের জন্য স্নায়ু শল্য চিকিৎসার ফল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিষময় হত। কেন না অদৃশ্য জীবাণুর দ্বারা অস্ত্রোপচার ক্ষেত্র দূষিত মত এবং পুঁজের উৎপাদন হয়ে রোগীর মৃত্যু হত। স্নায়ুশল্য চিকিৎসার উন্মেষের প্রারম্ভিককালের শল্য চিকিৎসকেরা ক্ষতের মধ্যে উৎপন্ন পুঁজ "শ্লাঘনীয় পূজ " বা "লডেবল্ পাস্" নামে অভিহিত করতেন। উক্ত বিচিত্র নামকরণ অজ্ঞতাপ্রসূত মাত্র। লিস্টার (৪৬) ক্ষতের জীবাণু দূষণ সর্বপ্রথম উপলব্ধি করে কার্বলিক অম্লের সাহায্যে অস্ত্রপচার কক্ষ, যন্ত্রাদি এবং অন্যান্য সামগ্রী পরিশোধনের ব্যবস্থা প্রচলন করেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, প্রাচীন ভারতের প্রখ্যাত শল্য চিকিৎসক সুশ্রুত অস্ত্রপচারের পূর্বে স্নান করতেন এবং রৌদ্রকিরণে স্নাত শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করতেন। তাঁর অস্ত্রোপচার কক্ষের অভ্যন্তরে গুগ্‌গুল, গন্ধক ইত্যাদি বস্তু প্রজ্জলিত করা হত। উক্ত দ্রব্যাদির ধূম্রের জীবাণু নিরোধক গুণ সম্বন্ধে আজ কারও মতানৈক্য নেই।

সিমেলবুস্ (৬২) প্রখ্যাত জার্মান স্নায়ু শল্য-চিকিৎসক ফন্ বের্গমান (৭০) এর অস্ত্রোপচার পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রচুর বিস্ময়কর তথ্য লিখে গিয়েছেন। ফন্ বের্গমান সর্বপ্রথম উচ্চচাপে আবদ্ধ উষ্ণ বাষ্প দ্বারা শল্য চিকিৎসার যন্ত্র ও বস্ত্র খণ্ডাদি পরিশোধনের প্রথার প্রবর্তক। যে পদ্ধতি আজ "অটোক্লেভিং" নামে সর্বজনবিদিত।

স্নায়ু শল্য-চিকিৎসার ক্রমিক উন্নতি

উপরে বিবৃত তথ্য সমূহের উপর ভিত্তি করে স্নায়ু শল্য-চিকিৎসাশাস্ত্রের উত্তরোত্তর উন্নতি হয়েছিল। বহু শল্য-চিকিৎসক যথেষ্ট অসুবিধা সত্ত্বেও পরম সাহসিকতার সঙ্গে স্নায়ুতন্তুর উপর অস্ত্রোপচার করতেন।

মস্তিষ্কের অর্বুদ অপসারণ

মেসওয়েন (৪৭) নামক স্কটল্যাণ্ডবাসী শল্য চিকিৎসককে বর্তমান কালের "মস্তিষ্কের শল্যতন্ত্রের জনক" বললে কোনও অত্যুক্তি হয় না। তিনি ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে সাফল্যের সঙ্গে এক রোগীর মস্তক থেকে অর্বুদ অপসারণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং সেই রোগী সুদীর্ঘ ৮ বছর বেঁচেছিল। তিনি ইতিপূর্বে মস্তিষ্কের অর্বুদ নির্ণয় ও স্থান নিরূপণ করতেও সক্ষম হয়েছিলেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ঠিক একশ বছর আগে ডুরাণ্টে (২৮) নামক অপর এক ইংরাজ শল্য-চিকিৎসক মস্তিষ্কের সম্মুখভাগের তলদেশ থেকে একটি অর্বুদ অপসারিত করেছিলেন।

কিন্তু কোনও এক অজ্ঞাত কারণে বেনেট্ ও গুড্‌লি (১২) নামক ইংরাজ শল্য চিকিৎসকদ্বয়কে অর্বুদ অপসারণের অগ্রণী বলা হয়! তথ্যটি আজও স্কটল্যাণ্ড ও ইংল্যাণ্ডের চিরন্তন ঈর্ষাপ্রসূত ইতিহাস বিকৃতি বলে পরিগণিত। তাঁদের প্রথম রোগীটি অস্ত্রোপচারের মাত্র কয়েকদিন পরে ক্ষতে জীবাণু দূষণ হয়ে মারা গিয়েছিল। ব্রামওয়েল (১৭) এবং ফন্ বের্গমান (৯৮) উভয়েই উক্ত ইতিহাস বিকৃতির অসত্যতা প্রমাণ করেছিলেন। হিরস্‌ফেলডের (৫৫) নামক জার্মান কুলোদ্ভব সান্‌ফ্রান্সিস্‌কোবাসী মার্কিন শল্য-চিকিৎসক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সর্বপ্রথম মস্তিষ্কের অর্বুদাপসারণে কৃতকার্য হয়েছিলেন (১৮৮৬)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলবাসী প্রখ্যাত শল্য-চিকিৎসক কীন (৪৫) ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে অনুরূপ এক শল্যকার্যে সফল হন। তাঁর রোগীটি ৩০ বছরেরও অধিককাল জীবিত ছিল।

স্নায়ুমণ্ডলের অর্বুদ

স্নায়ুমণ্ডলের অর্বুদ সম্বন্ধে বলতে গেলে স্নায়ুতন্ত্র সম্বন্ধে কিছু প্রাথমিক বক্তব্য অত্যাবশ্যক। বহির্জগতের সঙ্গে সব রকম সম্বন্ধ বজায় রাখবার জন্য মানব শরীরে বিশেষ বিশেষ পাঁচ প্রকার জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে যথা: চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক। উক্ত ইন্দ্রিয় সমূহের মাধ্যমে বাহ্য, আন্তরযন্ত্র ও কোষ সকল উত্তেজিত হ'লে সেই উত্তেজনা বিদ্যুৎতরঙ্গের মত স্নায়ুমণ্ডলের বিশেষ বিশেষ স্নায়ুকেন্দ্রে পোঁছে যায় এবং উপলব্ধ হয়।

সমস্ত স্নায়ুমণ্ডলীকে প্রধান দুইভাগে বিভক্ত করা হয় যথা: দৈহিক বা সোমাটিক্ (গ্রীক—সোমা অর্থে দেহ) এবং আন্তর যান্ত্রিক বা স্প্ল্যান্‌কনিক্ (গ্রীক—স্প্ল্যাখ্‌লন অর্থে আন্তর যন্ত্রাদি)। জ্ঞান ও কর্মেন্দ্রিয় নিয়ে যত ক্রিয়া কলাপ হয় সেগুলো দৈহিক এবং রক্তনালী, অন্তর ও বহিরশ্রাবী গ্রন্থী, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, যকৃৎ, প্লীহা, অন্ননালী, অন্ত্র প্রভৃতি দেহের আন্তর যন্ত্রগুলিকে আন্তরযান্ত্রিক স্নায়ুমণ্ডলী নিয়ন্ত্রিত করে। উক্ত দুই বিভাগেই সংবিদ প্রেরণা সঞ্চারি বা সেন্‌সারী ও আজ্ঞাবাহী বা মোটর স্নায়ুসূত্র থাকে। সংবিদ প্রেরণা অন্তর্মুখী এবং আজ্ঞাবাহী প্রেরণা বহির্মুখী।

স্নায়ুতন্ত্রের গঠনে স্নায়ুকোষ বা নিউরোন অতি গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি স্নায়ুকোষের একপ্রান্তে বৃক্ষের শাখা প্রশাখার মত বহু স্নায়ু থাকে। এগুলিকে দ্রোণ বা ডেন্‌ড্রন (সং—দ্রোণ বা বৃক্ষ, গ্রীক—ডেন্‌ড্রন অর্থে শাখা) বলা হয়। কোষের অপর প্রান্তে দীর্ঘ একটি স্নায়ুসূত্র থাকে যাকে বলা হয় অক্ষ বা এক্‌সন (সং—অক্ষ; লাতিন—এক্‌সন অর্থে অক্ষ)। উক্ত তিন উপাদানে ঘটিত অসংখ্য "একক" বা ইউনিট সমূহ দ্বারা সমগ্র স্নায়ুমণ্ডলের সৃষ্টি। কোন কোন অক্ষের বাইরে স্নেহ পদার্থ বহুল এক প্রকার আবরণ থাকে সেই আবরণকে "মজ্জা খোলস" বা মেডুলা বলা হয়। সেই কারণে মজ্জাখোলসযুক্ত স্নায়ুকে বলা হয় 'মজ্জাখোলসী' বা মেডুলেটেড্ নার্ভ এবং খোলস বিহীন স্নায়ুকে বলা হয় "নগ্নস্নায়ু" বা নন্‌-মেডুলেটেড নার্ভ।

মস্তিষ্ক দুটি প্রধান উপাদানে গঠিত যথা: ধূসর উপাদান বা গ্রে ম্যাটার ও শ্বেত উপাদান বা হোয়াইট্ ম্যাটার। মাথার খুলি উন্মোচন করলে দেখা যায় যে মস্তিষ্ক তিন প্রকার পর্দার আবরণে আচ্ছাদিত। বাইরের আবরণ অতি দৃঢ় (সং—দৃঢ়; লাতিন—ড্যুরুস, ড্যুরা অর্থে শক্ত) সেই জন্য উহাকে

"ড্রা" বলা হয়। ড্রার নীচের আবরণকে বলা হয় "জালি" বা অ্যারাখ্-নয়েড (লাতিন-আরাখ্নিস অর্থে জাল)। অ্যারাখ্নয়েড এর নীচে বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা আছে যার মধ্য দিয়ে মজ্জারস বা সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুয়িড্ সঞ্চালিত হয়। সবচেয়ে ভিতরের আবরণ মস্তিষ্কের ধূসর উপাদান সংলগ্ন এবং অতি কোমল, সেইজন্য তাকে বলা হয় 'কোমল আবরণ' বা পিয়া (লাতিন—পিয়া অর্থে কোমল)। উক্ত তিনটি আবরণ অতি সযত্নে মস্তিষ্ককে রক্ষা করে বলে তাদের নামকরণ করা হয়েছে "মাতৃসমা" বা মেটার (সং-মাতা, লাতিন-মেটার অর্থে মাতা)।

মস্তিষ্কের ধূসর উপাদান প্রধাণতঃ অসংখ্য স্নায়ুকোষ সমষ্টি দিয়ে গঠিত। কিন্তু দ্রোণ, স্নায়ুকোষ ও অক্ষ সমূহকে একত্রে সন্নিবিষ্ট রাখবার জন্য "গ্লিয়া" নামক (লাতিন—গ্লিয়া অর্থে আঠা ; ইং—গ্লু বা আঠা) কয়েক প্রকার সংযোগকারী কোষ আছে। আকৃতি ও প্রকৃতিগত বৈষম্যের জন্য উক্ত আঠার মত কোষকে "তারকা কোষ" বা অ্যাসট্রোসাইট্ (সং—তারকা ; লাতিন—অ্যাস্টেরা অর্থে তারকা), "দ্রোণ বিরল কোষ" বা ওলিগোডেন্-ড্রোগ্লিয়া (সং—দ্রোণ বা বৃক্ষ ; লাতিন ডেন্ড্রন অর্থে বৃক্ষ বা শাখা), ক্ষুদ্র কোষ বা মাইক্রোগ্লিয়া এবং "নিলয় আবরণী কোষ" বা এপেন্ডাইমা (গ্রীক-এপেন্ডাইমা অর্থে আবরণী) নামে অভিহিত করা হয়।

শারীরস্থানগত বিচারে, স্নায়ুমণ্ডল দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত যথা : মস্তিষ্ক এবং মেরুমজ্জা বা সুষুম্না। মস্তিষ্ক থাকে করোটির সুদৃঢ় অভ্যন্তরে। মেরুমজ্জা মস্তিষ্কের সবচেয়ে নীচের অংশ সুষুম্নাকাণ্ড বা মেডুলা থেকে ঝুলে থাকে। মেরুমজ্জা সুরু হয় করোটির "মহাবিবর" বা ফোরামেন ম্যাগ্নাম্ এর নীচ থেকে। সেখান থেকে পৃষ্ঠবংশের আভ্যন্তরীণ মজ্জা প্রাণালীর মধ্যে দিয়ে নীচে দ্বিতীয় "কাট্য" বা লাম্বার কশেরুকা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

মেরুমজ্জার ধূসর উপাদানের অবস্থান মস্তিষ্কের ঠিক বিপরীত, শ্বেত উপাদানের ভিতরে ধূসর উপাদান থাকে। মেরুমজ্জা অনেকটা মোটা বৈদ্যুতিক তারের মত অসংখ্য দীর্ঘ অক্ষসমূহ দ্বারা গঠিত যার মধ্যে কিছু বাহির থেকে ভিতরে সংবিদ প্রেরণা বহন করে এবং কিছু ভিতর থেকে বাহিরে আজ্ঞাবাহী প্রেরণা বহন করে।

মস্তিষ্ক থেকে বার জোড়া করোটি স্নায়ু উদ্ভূত হয় যথা : ঘ্রাণ স্নায়ু, বা ১নং স্নায়ু ; দৃষ্টি স্নায়ু বা ২নং স্নায়ু ; ৩, ৪, ও ৬নং অক্ষিগোলক সঞ্চালক

পেশীসমূহের স্নায়ু ; "ত্রিজ" স্নায়ু (ট্রাইজেমিনাল) বা ৫নং বা মুখমণ্ডলের সংবেদক স্নায়ু ; মুখের পেশী সঞ্চালক বা ৭নং স্নায়ু ; শ্রবণ স্নায়ু বা ৮নং স্নায়ু ; জিহ্বা বা গলবিল স্নায়ু বা ৯নং স্নায়ু (গ্লসোফারিন্জিয়াল), "ভবঘুরে" (ভেগাস) বা ১০নং স্নায়ু ; "সহকারী" (অ্যাকৃসেসরী) বা ১১নং স্নায়ু ; এবং জিহ্বা-নিম্ন (হাইপোগ্লসাল) বা ১২নং স্নায়ু। তদনুরূপ মেরুমজ্জা থেকে ৮ জোড়া গ্রীবা স্নায়ু (সারভাইক্যাল) ; ১২ জোড়া পর্শুকা স্নায়ু (ইণ্টারকষ্টাল), ৫ জোড়া কাট্য স্নায়ু (লাম্বার); ৫ জোড়া ত্রিকাস্থি স্নায়ু (সেক্রাল) এবং ১ জোড়া অনুত্রিকাস্থি (ককৃসিজিয়াল) স্নায়ু উদ্ভূত হয়ে কশেরুকা সমূহের অন্তবর্তী ছিদ্র দিয়ে বাহিরে আসে।

মস্তিষ্ক দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত (১) গুরু মস্তিষ্ক বা সেরিব্রাম এবং (২) লঘু মস্তিষ্ক বা সেরিবেলাম। গুরু মস্তিষ্ক করোটির উপরাংশের কোটরে থাকে উহা দক্ষিণ বা বাম গোলার্ধে বিভক্ত। অংশ দুটি বৃহৎ এক সেতুর মত গুরু মস্তিষ্ক যোজক বা করপাস্ ক্যালোসাম্ দ্বারা যুক্ত। গুরু মস্তিষ্কের অপরাপর অংশের বিভাজন অবস্থানগত বিচারে করা হয়েছে। যথা :

(১) পুরোভাগ বা ফ্রন্টাল লোবস্, (২) পশ্চাৎভাগ বা অকৃসিপিটাল লোবস্, (৩) উচ্চপার্শ্বভাগ বা প্যারাইটাল লোবস্, (৪) নিম্ন পার্শ্বভাগ বা টেম্পোরাল লোবস, (৫) সম্মুখ তলদেশ বা হাইপোথ্যালেমাস এবং (৬) মস্তিষ্কদণ্ড বা ব্রেনষ্টেম। করোটির নিম্ন প্রকোষ্ঠ উপরের প্রকোষ্ঠ থেকে পটাবাস বা তাঁবুর মত এক ডুরার আচ্ছাদন দিয়ে বিভক্ত। পটাবাসটির বৈজ্ঞানিক নাম টেন্টোরিআম্ সেরিবেল্লী (সং—তন্ত্র ; লাতিন—টেন্টুস অর্থে পটাবাস)। নিম্ন প্রকোষ্ঠের মধ্যে লঘু মস্তিষ্ক, গুরু মস্তিষ্কের পদযুগল বা সেরিব্রাল পিডাংকল, লঘু মস্তিষ্ক যোজক বা পনস্ এবং সুষুম্নাকাণ্ড বা মেডুলা অবস্থিত। লঘু মস্তিষ্কও দক্ষিণ বা বাম গোলার্ধে বিভক্ত এবং তিনটি যোজক দ্বারা যুক্ত। মস্তিষ্কের বহিভাগ ঢেউ খেলানো। ঢেউয়ের উত্তাল অংশকে বলা হয় "গিরি" বা গাইরাস (সং—গিরি ; লাতিন—গিরুস অর্থে পর্বত) এবং নিম্নাংশকে বলা হয় "খাদ" বা সাল্‌কাস্ উক্ত অভিনব গঠনের জন্য মস্তিষ্কের কোষবহুল ধূসর অংশের আয়তন অতি বিস্তৃত। মনুষ্যেতর প্রাণীর মস্তিষ্ক গিরি ও খাদ বিরল কেনা তাদের মধ্যে স্নায়ুকোষ সংখ্যা অনেক কম। করোটির স্বল্প পরিসর স্থানের মধ্যে অধিকতর স্নায়ুকোষের স্থান সঙ্কুলানের জন্য প্রকৃতির ও সৃষ্টিকর্তার ঐ অতি কুশলী প্রযুক্তি শৈলী সত্যই আশ্চর্যজনক !

উক্ত খাদ ও গিরিসমূহের দ্বারা মস্তিষ্কে আরও বিভিন্ন ছোট ছোট অংশে বিভক্ত এবং শারীরস্থান গত বিচারে অংশগুলির বিভিন্ন নামকরণের ফলে শারীরস্থান পাঠের পক্ষেও সুবিধাকারী।

গুরু মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপ

(১) ইহা মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার এই অন্তঃকরণ চতুষ্টয়ের মর্মকেন্দ্র।

(২) ইহার ধূসর উপাদান সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয়জ্ঞান, অনুভূতি ও সকল কর্মেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করে। বাচন, পঠন ও লিখনের মূল স্নায়ুকেন্দ্র সমূহও এখানে অবস্থিত। (৩) জ্ঞান ও কর্মপ্রেরণা বহু স্নায়ু দ্বারা এই স্থান থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়। (৪) সকল প্রকার শুভ ও অশুভ স্পর্শ চেতনা এই স্থানেই নিশ্চিতভাবে বিশ্লেষিত ও উপলব্ধ হয়। (৬) সমস্ত আজ্ঞাবাহী ও অবচেতন আজ্ঞাবাহী স্নায়ু কেন্দ্রসমূহ এইস্থানে অবস্থিত। যাহাদের সাহায্যে পেশী সঞ্চালন প্রভৃতি ঐচ্ছিক ক্রিয়া এবং মাংসপেশীর "তান" বা টোন (সং—তান ; লাতিন—টোনুস অর্থে টান) এখান থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়।

মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে বিচিত্রাকৃতি নিলয় বা ভেন্ট্রিকলস্ থাকে। উক্ত নিলয়ের প্রধান অংশগুলি গুরু মস্তিষ্কের মধ্যে অবস্থিত।

নিলয়গুলির পার্শ্ব ও তৃতীয় প্রকোষ্ঠে মজ্জারস ক্ষরিত হয় এবং নিলয়ের ৩য় ও ৪র্থ কোটরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে লঘু মস্তিষ্কের তলদেশে অবস্থিত ৩টি ছিদ্র দিয়ে মস্তিষ্কের জালি আবরণ ও কোমল আবরণের মধ্যস্থ শূণ্য স্থানে সঞ্চালিত হয় এবং সমগ্র মস্তিষ্কের বহিভাগকে মজ্জারসে স্নাত করে।

লঘু মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপ

লঘু মস্তিষ্ক গুরু মস্তিষ্কের চেয়ে অনেক ছোট এবং মস্তিষ্কদণ্ডের মাধ্যমে উহা গুরু মস্তিষ্কের সঙ্গে যুক্ত থাকে। বিবর্তনগত বিচারে মস্তিষ্কদণ্ড মস্তিষ্কের অতি আদিম অংশ। কেননা মনুষ্যেতর প্রাণীর মধ্যেও মস্তিষ্কদণ্ডের ক্রিয়াকলাপ দ্বারা ঐ সকল প্রাণীর জান্তব প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত হয়। লঘু মস্তিষ্কও দুই গোলার্দ্ধে বিভক্ত এবং উহার উপরিভাগও ঢেউ খেলানো। উহার দুটি গোলার্দ্ধে তিন জোড়া যোজক দ্বারা যুক্ত। বাহিরে দৃশ্য যোজকটি অনেকটি "কেঁচোর" মত দেখতে বলে উহার নামকরণ করা হয়েছে "কীট" বা ভার্‌মিস (লাতিন– ভার্‌মিস অর্থে কেঁচো বা কীট)।

লঘু মস্তিষ্ক মানুষের দেহের অঙ্গ বিন্যাস, ভারসাম্য, সুসংবদ্ধ পেশী চালনা ও সুসংগত গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করে। উহা পেশীসমূহের মৌলিক তান বা টোন-এর নিয়ন্ত্রক। শিশুর জন্মের সময় থেকে লঘু মস্তিষ্কে অনেক কৌষিক ভাঙা গড়া হয়ে পরিণত বয়সে মানুষের উপরিউক্ত কার্য্যকারিতা সমূহ সম্পূর্ণ বিকশিত হয়। সেই জন্য শিশুর দ্রুত গঠনরত লঘু মস্তিষ্কে অর্বুদের প্রাদুর্ভাব অতি প্রবল কেননা গঠনের কালে কোষ বিভাজন নিয়ন্ত্রণে সামান্য ভুল ত্রুটি হলেই লঘুমস্তিষ্কে অর্বুদের সৃষ্টি হতে পারে।

নিদানতাত্ত্বিক অর্বুদবিচার

ভ্রূণতত্ত্বগত বিচারে স্নায়ুমণ্ডলীর কোষ সমূহ ভ্রূণের বহিস্ত্বক (একটোডার্ম) থেকে উদ্ভূত। মাতৃগর্ভে ভ্রূণের দেহ গঠনের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে মধ্যত্বক্ (মেজোডার্ম) থেকে ধমণী ও শিরা উক্ত আদিম স্নায়ুমণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ করে। ক্রমে ক্রমে স্নায়ুতন্ত্র শরীরের অন্যান্য তন্তুর চেয়ে আকৃতি ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য লাভ করে। সমগ্র স্নায়ুকোষ ও গ্লিয়াকোষ সমূহ যদিও বহিস্ত্বক থেকে উদ্ভূত তবুও সেখানে উদ্ভূত অর্বুদ সাধারণ বহিস্ত্বকের অর্বুদের চেয়ে ভিন্নধর্মী। স্নায়ুমণ্ডলের বহির্ভূত তন্তু সমূহের ভীষণধর্মী অর্বুদ (ম্যালিগনাণ্ট টিউমার) কোষ শিরা, লসিকা প্রণালী ও নিকট সান্নিধ্যের মাধ্যমে শরীরে অন্য স্থানে প্রসার লাভ করে রোগীকে বধ করে। কিন্তু স্নায়ুমণ্ডলীর ভীষণ ধর্মী অর্বুদের কোষ, কদাচিৎ অনুরূপভাবে অন্যত্র বিস্তৃত হয়। মূল স্নায়ুকোষ অপেক্ষা গ্লিয়া কোষ, মাতৃসমা জালিকোষ, সর্দার গ্রন্থি কোষ, স্নায়ুরজ্জুর আবরণীকোষ ইত্যাদি থেকে অধিক সংখ্যায় অর্বুদ উৎপন্ন হয়। ইহা ব্যতীত শরীরের অন্যান্য স্থানের ভীষণ ধর্মী অর্বুদ স্নায়ুমণ্ডলীর মধ্যে বিস্তার লাভ করে। নিম্নের সারণী থেকে উক্ত বক্তব্যের বিশদ বিবরণী দ্রষ্টব্য :

(ক) গ্লিয়া কোষজাত অর্বুদ :
- (১) তারকা কোষ জাত (অ্যাসট্রোসাইটোমা)
- (২) আদিমগ্লিয়া কোষ জাত (মেডুলোব্লাস্টোমা)
- (৩) নিলয় কোষ জাত (এপেন্ডাইমোমা)
- (৪) দ্রোণবিরল কোষ জাত (ওলিগোডেনড্রোগ্লিওমা)
- (৫) ক্ষুদ্রগ্লিয়া কোষ জাত (মাইক্রোগ্লিওমা)

(খ) মাতৃসমা জালি কোষ জাত (মেনিন্জিওমা)

(গ) সর্দার গ্রন্থি কোষ জাত (পিটুইটারী গ্ল্যাণ্ড টিউমারস)
(১) রঞ্জকভীরু কোষ জাত (ক্রোমোফোব অ্যাডিনোমা)
(২) রঞ্জকপ্রিয় কোষ জাত (ক্রোমোফিল অ্যাডিনোমা)
(ক) উষারঞ্জক প্রিয় (ইওসিনোফিল অ্যাডিনোমা-সং—উষা, গ্রীক—ইওস অর্থে উষা)
(খ) নীল রঞ্জক প্রিয় (বেসোফিল অ্যাডিনোমা)
(গ) আদিম কোষী (ক্রানিও-ফ্যারিন্জিওমা বা রাথ্‌কে-এর থলির অর্বুদ)

(ঘ) স্নায়ুরজ্জুর আবরণী কোষজাত
(১) সাধারণ স্নায়ুর অর্বুদ (নিউরোমা)
(২) শ্রবণ স্নায়ুর অর্বুদ (অ্যাকাউসটিক্ নিউরোমা)

(ঙ) জীবাণুজাত অর্বুদ লক্ষণ বিকাশী স্ফীতি
(১) যক্ষাজীবাণুজাত (টিউবারকিউলোমা)
(২) পুঁজ সৃষ্টিকারী জীবাণুজাত মস্তিষ্কের ফোঁড়া (ব্রেন অ্যাব্‌সেস)

(চ) করোটি হইতে উদ্ভূত অভ্যন্তরে প্রবেশকারী অর্বুদসমূহ (স্কাল টিউমারস)
(১) অস্থিজাত অর্বুদ (অস্‌টিওমা) (চিত্র ১৭)
(২) মধ্যত্বকজাত ভীষণধর্মী অর্বুদ বা সার্‌কোমা

(ছ) ভীষণধর্মী অর্বুদ হইতে বিস্তৃত অর্বুদ (মেটাষ্টেটিক্ টিউমারস্)
(১) স্তনকর্কট কোষী (ব্রেষ্ট্ কারসিনোমা)
(২) শ্বাসনালীর কর্কট কোষী (ব্রঙ্কিয়াল্ কারাসিনোমা)
(৩) বৃকক্-কর্কটকোষী (রেনাল্ কারসিনোমা)
(৪) ঢালগ্রন্থি কর্কট কোষী (থাইরয়েড কারসিনোমা, সং—দ্বার ; লাতিন—থ্যুরা, থাইরস অর্থে ঢাল বা দ্বার)
(৫) জরায়ুগ্রন্থি কর্কট কোষী (ইউটেরাইন্ কারসিনেনোমা)
(৬) অন্ত্রগ্রন্থি কর্কট কোষী (ইউটেসটিনাল্ কারসিনোমা)
(৭) প্রস্থিতগ্রন্থি কর্কট কোষী (প্রস্‌টেটিক কারসিনোমা, সং—প্রস্থিত অর্থে অগ্রে অবস্থিত ; লাতিন-প্রষ্টাটা অর্থে অগ্রেস্থিত)
(৮) মলান্ত্র কর্কট কোষী (রেকটাল্ কারসিনোমা)
(৯) মধ্যত্বকের ভীষণধর্মী কোষজাত অর্বুদ (সার্‌কোমা)

ইহা ব্যতীত স্নায়ুতন্ত্রে ভ্রূণাবস্থায় গঠন বৈকল্যের ফলে শরীরের বহিভাগের কোষসমষ্টি স্নায়ুমণ্ডলীর মধ্যে অন্তরীণাবদ্ধ হতে পারে। সেই অন্তরীণাবদ্ধ কোষসমূহ থেকে ভবিষ্যতে (১) "দৈত্যার্বুদ" (টেরাটোমা, লাতিন—টেরাস অর্থে দৈত্য) (২) পিত্তস্নেহকোষী অর্বুদ (কোলেষ্টিয়াটোমা) (৩) চর্মকোষী অর্বুদ (ডারময়েডস্) (৪) আদিম কশেরুকা কোষী অর্বুদ (কর্ডোমা) প্রভৃতি উদ্ভূত হতে পারে। অনেক সময় স্নায়ুমণ্ডলের শিরা ও ধমনীর স্ফীতির কারণে অ্যান্‌জিওমা বা রক্তনালীর অর্বুদও সৃষ্টি হয়।

স্নায়ুমণ্ডলের অর্বুদের সাধারণ লক্ষণ

(ক) মস্তিষ্কের অর্বুদ

করোটির অভ্যন্তরস্থ অর্বুদ স্থানাভাব ঘটায় এবং ভিতরে ক্রমবর্ধমান উচ্চ-চাপের সৃষ্টি করে। উক্ত উচ্চচাপের ফলে রোগী মস্তকে ক্রমবর্ধমান তীব্র বেদনা অনুভব করে ও অকারণ বমি করে। ধীরে ধীরে উচ্চচাপের ফলে অক্ষিগোলকের শিরার মধ্য দিয়ে রক্ত সঞ্চালন ব্যাহত হয় এবং অক্ষিপটে শোথ হয়, যার ফলে দৃষ্টি ক্রমশঃ ক্ষীণ হতে আরম্ভ করে। উক্ত "ত্রয়ী লক্ষণ" সমূহ যথা: (১) মস্তকের ক্রমবর্ধমান বেদনা (২) অকারণে বমন (৩) ক্রমিক দৃষ্টিহানি করোটির অভ্যন্তরস্থ অর্বুদের প্রধান বাহ্যাভিব্যক্তি।

ইহা সর্বজনবিদিত যে, মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্থান থেকে শরীরের ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রিত হয়। অর্বুদের আয়তন বৃদ্ধির ফলে সন্নিকটস্থ মস্তিষ্কের অংশ বিশেষের কার্য ব্যাহত হয় এবং নানাবিধ পক্ষাঘাতের ও অন্যান্য লক্ষণের সৃষ্টি হয়। কোন কোনও অর্বুদ আজ্ঞাবাহী স্নায়ুকেন্দ্র সমূহকে উত্তেজিত করে এবং রোগী মৃগীরোগগ্রস্ত হয়। উচ্চচাপের ফলে অতি সংবেদনশীল ভবঘুরে (ভেগাস) স্নায়ুকেন্দ্রও উত্তেজিত হয় এবং হৃদস্পন্দন স্তিমিত হয় (ব্র্যাডিকার্ডিয়া) এবং রোগী অকারণ বমি করে।

সারণীবদ্ধভাবে মস্তিষ্কের অর্বুদের অবস্থান নিম্নরূপ : করোটির উচ্চ প্রকোষ্ঠের অর্বুদসমূহ

(ক) পুরোভাগের অর্বুদ (ফ্রন্‌টাল)
(খ) উচ্চপার্শ্বের অর্বুদ (প্যারাইটাল্)
(গ) নিম্নপার্শ্বের অর্বুদ (টেম্পোরাল্)

(ঘ) মস্তিষ্ক যোজকের অর্বুদ (করপাস ক্যালোসাল)
(ঙ) পশ্চাতের অর্বুদ (অক্সিপিটাল্)
(চ) পার্শ্বনিলয়ের অর্বুদ (ল্যাটারাল্ ভেন্ট্রিকিউলার)
(ছ) সর্দারগ্রন্থির অর্বুদসমূহ (পিটুইটারী গ্ল্যাণ্ড টিউমারস্)
  (১) রঞ্জকভীরু কোষজাত (ক্রোমোফোব)
  (২) রঞ্জকপ্রিয় কোষজাত (ক্রোমোফিল্)
    (ক) উষারঞ্জক প্রিয় (ইওসিনোফিল্)
    (খ) নীলরঞ্জক প্রিয় (বেজোফিল্)
  (৩) আদিম কোষী (ক্রানিওফারিন্‌জিয়াল্)
  (৪) গ্লিয়াকোষজাত (গ্লায়াল)
(জ) তুর্কীকেদারার পারিপার্শ্বিকের অর্বুদ (প্যারাসেলার টিউমারস্)
(ঝ) তৃতীয় নিলয়ের অর্বুদ (থার্ডভেন্ট্রিকিউলার)
(ঞ) মধ্য মস্তিষ্কের অর্বুদ (মিড্‌ব্রেণ টিউমার)

করোটির নিম্ন প্রকোষ্ঠের অর্বুদসমূহ (পটাবাসের নিম্নস্থ)

(ক) কীট বা ভার্মিসএর অর্বুদ (ভার্মিস টিউমার)
(খ) লঘু মস্তিষ্ক গোলার্ধের অর্বুদ (সেরিবেল্লার হেমিস্ফেরিক্)
(গ) লঘু মস্তিষ্ক সেতু কোণের অর্বুদ (সেরিবেল্লো-পণ্টাইন্ এ্যাঙ্গেল)
(ঘ) চতুর্থ নিলয়ের অর্বুদ (ফোর্থ ভেন্ট্রিকল্ টিউমার)
(ঙ) মস্তিষ্ক দণ্ডের সম্মুখের অর্বুদ (ব্রেন ষ্টেম টিউমার)
(চ) মস্তিষ্ক দণ্ডের আভ্যন্তরীণ অর্বুদ (ইনট্রিনসিক্ ব্রেনষ্টেম টিউমার)

অবস্থান গতবিচারে মস্তিষ্কের অর্বুদের রোগ লক্ষণ

(ক) পুরোভাগের অর্বুদ (ফ্রন্‌টাল লোব টিউমার)

শারীর বিজ্ঞানে মস্তিষ্কের পুরোভাগকে "নিস্তব্ধ অঞ্চল" বা সাইলেন্ট এরিয়া নামে অভিহিত করা হয়। পুরোভাগের অর্বুদ বা অন্যান্য রোগের অভিব্যক্তি অত্যন্ত দেরীতে হয় বলেই অনুরূপ নামকরণ করা হয়েছে।

উক্ত অর্বুদ বিভিন্ন প্রকারের হয় যথা :—শান্তধর্মী বা বিনাইন এবং ভীষণ ধর্মী বা ম্যালিগ্‌নান্ট। উক্ত অর্বুদ সমূহ বহু কাল ধরে পুরোভাগের অভ্যন্তরে

বর্ধিত হয়। প্রথমতঃ রোগী কিছুই বুঝিতে পারে না। ধীরে ধীরে যখন অর্বুদটি আরও বড় হয় তখন রোগের বাহ্যিক অভিব্যক্তি ঘটে।

রোগীর কর্মক্ষমতা ক্রমশঃ কমতে থাকে এবং পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সে উদাসীন হ'তে থাকে। অতিশয় দুঃখও তাকে হঠাৎ আনন্দে উৎফুল্ল করে এবং পরবর্তীক্ষণেই সে উচ্চৈস্বরে বিলাপ করে ও কেঁদে ফেলে! উক্ত লক্ষণটা "হিবৎসেল স্থখত্" নামে স্থবিদিত। কথাটি জার্মান, অর্থ, হঠাৎ আবেগের বিবেচনা হীনতা। ক্রমে ক্রমে রোগীর স্মৃতি শক্তি বিলোপ হয় এবং কাল্পনিক কাহিনী বিবৃত করতে আগ্রহী হয়। অতি দীন ও দরিদ্র রোগী বলে যে, সে লক্ষপতি ইত্যাদি। সেই অবস্থায় রোগীর আচরণে মনে হয় যে, সে মানসিক রোগগ্রস্ত; স্বতঃই আত্মীয় পরিজনেরা তাকে মানসিক রোগ চিকিৎসকের অধীনস্থ ক'রে। কিন্তু অতি সত্বর স্নায়ুবিক উপসর্গ দেখা দেয় যা মানসিক রোগের চেয়ে ভিন্নধর্মী। সাধারণতঃ মস্তিষ্কের বাম পার্শ্বের অর্বুদের লক্ষণ আগে প্রকাশ পায় কেননা বামদিকের অর্বুদ অতি দ্রুত বাচন ক্ষমতা হানি করে। শতকরা ৯৫ ভাগ মানুষের বাচন মহাকেন্দ্র বা ব্রোকাজ সেণ্টার মস্তিষ্কের বামদিকের পুরোভাগে অবস্থিত। ক্রম বর্ধমান অর্বুদ ধীরে ধীরে পেশীসঞ্চালক স্নায়ু কোষ এবং অনুভূতীস্পর্শী স্নায়ুকোষ সমূহকেও আক্ষেপিত করে এবং পক্ষাঘাত, স্পর্শলোপ ও মৃগী রূপে অভিব্যক্ত হয়। অতি বৃহদাকৃতি অর্বুদ করোটির অভ্যন্তরে স্থানাভাব ঘটায় ও উচ্চচাপ সৃষ্ট করে, ফলে মস্তকে বেদনা, বমন ও ক্রমিক দৃষ্টি হানি হয়। উক্ত তিনটি লক্ষণকে "ত্রয়ী লক্ষণ" বা ট্রায়াড অব্ সিম্প্টমস্ বলা হয়।

(খ) উচ্চ পার্শ্বের অর্বুদ বা (প্যারাইটাল্ লোব্ টিউমার)

উচ্চপার্শ্বের অর্বুদ শরীরে বিভিন্ন বিশেষ স্পর্শানুভূতির ব্যাঘাত ঘটায়। প্রথমতঃ সূক্ষ্ম স্পর্শানুভূতি বিলুপ্ত হয়। রোগী সন্নিকটে দৃশ্যমান বিভিন্ন আকৃতি বস্তুর মধ্যে প্রভেদ বিচার করতে পারে না। অনেক সময় রোগী নিজের শরীরের অর্ধাঙ্গের অবস্থান ও নিরাপত্তা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে যায়। ক্লিষ্ট অর্ধাঙ্গে গুরুতর আঘাত লাগলেও রোগী ভ্রূক্ষেপও করে না। ক্রমে ক্রমে রোগীর পঠন, লিখন ও বাচন ক্ষমতা ব্যাহত হয়। অর্বুদের আকৃতি ও প্রকৃতি গত ভিন্নতাও রোগ লক্ষণকে প্রভাবিত করে। ক্রমশঃ রোগী পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয় ও তার মৃগী রোগ দেখা দেয়। অতি বৃহৎ অর্বুদ "ত্রয়ী লক্ষণ" বিকাশী। (চিত্র ১৭)

(গ) নিম্নপার্শ্বের অর্বুদ (টেম্পোরাল লোব্ টিউমার)

দক্ষিণ হস্ত ব্যবহারকারী অধিকাংশ মানুষের বামদিকের নিম্নপার্শ্বের অর্বুদের লক্ষণ অতি দ্রুত বিকাশশীল। উক্ত স্থানের অতি সন্নিকটে বাচন মহাকেন্দ্র অবস্থিত থাকার জন্য রোগীর বাচন ক্ষমতা অতি দ্রুত হ্রাস পায়। কোনও কোনও রোগী এক অভিনব প্রকারের মৃগী রোগে আক্রান্ত হয়, যার বিজ্ঞান ভিত্তিক ইংরাজী নাম "টেম্পোরাল লোব এপিলেপ্সি"। ঐ বিচিত্র মৃগী আক্ষেপের উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে কোনও আপাত দৃষ্টিতে সুস্থ ব্যক্তি হঠাৎ প্রবল উন্মাদ রোগগ্রস্তের মত আচরণ করতে আরম্ভ করে এবং জিনিসপত্র ভাঙ্গচুর করে, কোন নিরীহ ব্যক্তিকে আঘাত করে অথবা উদ্দেশ্যহীন ভাবে দৌড়াতে আরম্ভ করে। উক্ত প্রকার মৃগী রোগগ্রস্তের দ্বারা নিরীহ ব্যক্তির প্রাণ নাশের বহু দৃষ্টান্ত চিকিৎসাশাস্ত্রে আছে। আক্ষেপের পূর্বে কোনও কোনও রোগী অলীক দৃশ্য দেখে বা তার প্রিয় গান, কবিতা বা অতি পরিচিত কারও কণ্ঠস্বর শুনতে পায়। অনেক রোগী অকারণে সুগন্ধ বা পূতিগন্ধ অনুভব করে। উক্ত লক্ষণ সমূহ বিকাশের কারণ এই যে, শ্রবণ স্নায়ুকেন্দ্র, ঘ্রাণ স্নায়ুকেন্দ্র নিম্ন পার্শ্বে অবস্থিত এবং অর্বুদ স্নায়ুকেন্দ্রগুলিকে উত্তেজিত ক'রে বলে অনুরূপ অনুভূতি হয়। আমার এক রোগী মৃগী আক্ষেপের অব্যবহিত পূর্বে কবি নজরুল ইসলামের গান "বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল শাখাতে দিসনে আজি দোল" এই কলিটি শুন্তে পেতেন। অপর এক নিষ্ঠাবান হিন্দু বিধবা রোগিণী পোড়া মাংসের গন্ধ পেতেন এবং তৃপ্ত আহারের ভঙ্গী করতেন।

নিম্ন পার্শ্বের গভীর অভ্যন্তরের মধ্য দিয়ে দৃষ্টি স্নায়ু প্রবাহ বা অপ্টিক র‍্যাডিয়েশান্ মস্তিষ্কের পশ্চাৎভাগে অবস্থিত দৃষ্টি মহাকেন্দ্রের দিকে ধাবিত হয়। উক্ত প্রবাহের কার্য ব্যাহত হ'লে নানা প্রকার আংশিক দৃষ্টি হানি হয়। অতি বৃহৎ অর্বুদ "ত্রয়ী লক্ষণ" বিকাশী।

(ঘ) মস্তিষ্ক যোজকের অর্বুদ (করপাস ক্যালোসাম্ টিউমার)

মস্তিষ্ক যোজক গুরু মস্তিষ্কের দুই গোলার্ধের সংযোজক এক বৃহৎ স্নায়বিক সেতু। সেতুটির মধ্য দিয়ে অসংখ্য স্নায়ুসূত্র দুই দিকে প্রবাহিত হয়। গ্লিয়াকোষ জাত অর্বুদের প্রায় এক তৃতীয়াংশ সেতুটির মধ্যে প্রবেশ ক'রে কার্য ব্যাহত করে। সেতুটির বিশেষ অংশের রোগ বিজড়ন সেই স্থানের যে স্নায়ুসূত্রগুলিকে ধ্বংস করে তদনুযায়ী রোগ লক্ষণ প্রকাশিত হয়। সম্মুখস্থ

অর্বুদ পুরোভাগের অর্বুদের লক্ষণ বিকাশী। মধ্যবর্তী অর্বুদ ঐচ্ছিক দেহ সঞ্চালন ও স্পর্শানুভূতি ব্যাহত করে। পশ্চাতের অর্বুদ মস্তিষ্ক নিলয়ের তৃতীয় প্রকোষ্ঠের উপর চাপ সৃষ্ট করে এবং "ত্রয়ী লক্ষণ" প্রকাশ পায়।

(ঙ) পশ্চাতের অর্বুদ (অক্সিপিটাল লোব টিউমার)

পশ্চাতের অর্বুদ সংখ্যানুপাতে অপরাংশের চেয়ে বিরল, কারণ অজ্ঞাত। অর্বুদ বিপরীত দিকের দৃষ্টি হানি করে কেননা উক্তস্থানে দৃষ্টি মহাকেন্দ্র অবস্থিত। অনেক রোগী মৃগীগ্রস্ত হয় এবং আক্ষেপের অব্যবহিত পূর্বে অলীক দৃশ্য বা হঠাৎ উজ্জ্বল আলোর ঝলকানি দেখতে পায়। বৃহদাকৃতি অর্বুদ উচ্চচাপ ও ত্রয়ীলক্ষণ সৃষ্টি করে।

(চ) পার্শ্বনিলয়ের অর্বুদ (ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকল্ টিউমার)

পার্শ্বনিলয়ের জালিকোষজাত, নিলয় কোষজাত ও চর্মকোষজাত অর্বুদ হয়। আমাদের দেশে যক্ষ্মারোগ জীবাণুজাত অর্বুদও প্রচুর দেখা যায়। রোগগ্রস্ত নিলয়ের দিকের মস্তকার্দ্ধে প্রথম বেদনা আরম্ভ হয়। ক্রমশঃ দৃষ্টিহানি ঘটে ও আক্লিষ্ট মস্তিষ্কের অপরদিকের দেহার্দ্ধে পক্ষাঘাত দেখা দেয়, স্পর্শানুভূতির বিলুপ্তিও নিতান্ত কম হয় না। অজ্ঞাত কারণে কোনও কোনও রোগীর দেহের ভারসাম্য রক্ষায় ব্যাঘাত ঘটে।

করোটির মধ্যপ্রকোষ্ঠের অর্বুদসমূহ (মিডল্ ক্রানিয়াল ফসা টিউমার)

করোটির মধ্য প্রকোষ্ঠের অর্বুদসমূহের মধ্যে সর্দার গ্রন্থি বা পিটুইটারী গ্ল্যাণ্ডের অর্বুদ সর্বাধিক। শরীরের সমস্ত নালীবিহীন গ্রন্থির মধ্যে সর্দারগ্রন্থি অতি গুরুত্বপূর্ণ কেননা উহার নিঃসৃত রসদ্বারা অপরাপর নালীবিহীন ঢালগ্রন্থি (থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড),, পার্শ্ব ঢালগ্রন্থি (প্যারা-থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড), বৃক্কশীর্ষ গ্রন্থি (সুপ্রারিনাল গ্ল্যাণ্ড), ডিম্বাধার (ওভারী) এবং অণ্ডকোষের কার্য নিয়ন্ত্রিত হয়।

(ছ) সর্দারগ্রন্থির অর্বুদ কোষ বিভেদে বিভিন্ন প্রকারের হয়। যথা:

(১) রঞ্জকভীরু কোষজাত (ক্রোমোফোব টিউমার)

(২) রঞ্জকপ্রিয় কোষজাত (ক্রোমোফিল্ টিউমার)

  (ক) উষারঞ্জক প্রিয় (ইওসিনোফিল্ টিউমার)

  (খ) নীলরঞ্জক প্রিয় (বেসোফিল্ টিউমার)

(৩) আদিমকোষী (ক্র্যানিওফ্যারিনজিওমা)

(৪) গ্লিয়া কোষজাত (পিটুইটারী গ্লিওমা)

(ক) রঞ্জকভীরু কোষজাত অর্বুদের লক্ষণ

রঞ্জকভীরু কোষজাত অর্বুদ সর্বাধিক সংখ্যায় দেখা যায়। পুরুষ ও মহিলা উভয়ের মধ্যেই উক্ত প্রকারের অর্বুদ প্রায় সমান ভাগে হয়। অর্বুদ চার প্রকারে রোগীর ক্ষতি সাধন করে :

(১) যুবতীদের রজঃস্রাব বন্ধ বা কোনও রোগিনীর স্তন থেকে অকারণ দুগ্ধ নিঃসরণ। দেহে মেদাধিক্য। যৌন কামনা ও ক্ষমতা হ্রাস। রক্ত-শূণ্যতা, রক্তচাপহীনতা ও রক্তে দ্রাক্ষা-শর্করা হ্রাস ইত্যাদি।

পুরুষ রোগীদেরও যৌন কামনা ও অনুভূতি হ্রাস ও পুরুষত্বহীনতা হয়।

(২) ক্রমিক দৃষ্টিশক্তি হানী। অর্বুদ-চক্ষু স্নায়ুর অতি সন্নিকটে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য চক্ষু স্নায়ুর উপর চাপ সৃষ্টি করে এবং ধীরে ধীরে দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পায়।

(৩) অর্বুদ উপরের দিকে প্রসারিত হ'লে মাস্তষ্কের তৃতীয় নিলয়ের উপর চাপ সৃষ্টি করে এবং মস্তিষ্কের রস সঞ্চালন ব্যাহত হ'য়ে মস্তিষ্কোদক হয়। তৃতীয় নিলয়ের তলদেশে অবস্থিত আন্তর্যান্ত্রিক স্নায়ুমণ্ডলীর কোষসমূহের কার্যে চরম ব্যাঘাত হয়।

(খ) উষারঞ্জক কোষের অর্বুদ

উষারঞ্জক কোষের অর্বুদ অতি অধিক মাত্রায় মানব দেহের আকৃতি বিকাশী হরমোন বা গ্রোথ হরমোন নিঃসরণ করে। যদি রোগীর বয়স ২৫ বৎসরের নীচে হয় তাহলে তার দেহ বিশাল দৈত্যাকৃতি ধারণ করে। উক্ত রোগগ্রস্ত পৃথিবীর দীর্ঘতম মানুষ রবার্ট ওয়াড্‌লো মার্কিন দেশবাসী ছিলেন। তাঁর উচ্চতা ৮ ফুটেরও বেশী ছিল (চিত্র ১৮)। ২৫ বৎসর বয়ঃক্রম কালের পরে রোগ হ'লে রোগীর মুখাবয়ব ও হাত পায়ের অদ্ভুত পরিবর্তন হয়। নীচের চোয়ালের হাড় অস্বাভাবিক বড় হয়, যাকে হনুবৃদ্ধি বা প্রগ্নাথস্ বলা হয়। হনু বৃদ্ধির ফলে দাঁতের পংক্তি ফাঁক হয়ে যায়। রোগীর হাত ও পায়ের আঙ্গুল বড় হয়ে যায়, লক্ষণটিকে অঙ্গুলী বৃদ্ধি বা অ্যাক্রোমেগালী বলা হ'য়। রোগী ও রোগীনির যৌনক্ষমতা হ্রাস পায় রক্তচাপ বৃদ্ধি হয় ও রক্তে দ্রাক্ষা-শর্করা বেড়ে যায়। অতি বৃহদাকৃতি অর্বুদ দৃষ্টিহানি ঘটায়।

(গ) নীলরঞ্জকপ্রিয় কোষী অর্বুদ

উক্ত অর্বুদ স্ত্রীরোগীদের মধ্যে সর্বাধিক দেখা যায়। রোগীনির মুখের আকৃতি চাঁদের মত গোল হ'য়ে যায়, যাকে বলা হয় চন্দ্রবদন বা মুন্‌ফেসিস্। উদরে, পশ্চাতদেশ ও জঙ্ঘায় মেদ বৃদ্ধি হয়। সেই সব জায়গার চামড়ায় গোলাপী রং-এর ফাটল ধরে। রোগীনির রজঃস্রাব বন্ধ হয়, রক্তচাপ অস্বাভিক বৃদ্ধি পায় এবং মধুমেহ রোগ হয়। নীলরঞ্জকপ্রিয় অর্বুদ অতি ক্ষুদ্রাকৃতি হয়, সেইজন্য কোনও পারিপার্শ্বিক চাপের সৃষ্টি করে না। উক্ত অর্বুদ কেবলমাত্র শল্য অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে নাসিকার মধ্য দিয়ে অপসারিত করা সম্ভব।

(ঘ) আদিম কোষী অর্বুদ

সর্দারগ্রন্থি মস্তিষ্কের তলদেশ থেকে একটি ঝুলন্ত মুকুলাকৃতি কোষসমষ্টি ও আদিম মুখগহ্বর থেকে উদ্ভুত উর্দ্ধগামী অপর এক মুকুলাকৃতি কোষ সমষ্টির সংযোজনে গঠিত। শেষোক্ত মুকুলটি জার্মান ভ্রূণতত্ত্ববিদ্ রাথ্‌কে এর নামে "রাথকের থলি" বা ক্রানিওফ্যারিঞ্জিয়াল ডাক্‌ট নামে পরিচিত। রাথকের থলির গঠন বৈকল্যের জন্য আদিমকোষী অর্বুদ বা ক্র্যানিওফ্যারিন্‌জিপমা উৎপন্ন হয়। রোগটি অধিকাংশে কিশোর ও কিশোরীদের মধ্যে দেখা যায়। দৃষ্টিহানি ও সর্দার গ্রন্থির আন্তরস নিঃসরণের ব্যাঘাতজনিত শারীরিক অপুষ্টতা এই রোগের প্রধান দু'টি লক্ষণ। অনেক যুবক বা যুবতী রোগীকে ১০।১২ বৎসর বয়স্ক কিশোর বা কিশোরীর মত দেখতে লাগে। পুরুষ রোগীর শিশ্ন শিশুর শিশ্নের মত ক্ষুদ্র থেকে যায়। (চিত্র ১৯)

(ঙ) তুর্কীকেদারার পারিপার্শিকের অর্বুদ

তুর্কিকেদারা বা সেল্লাতুর্চিকা (লাতিন, সেল্লা—কেদারা ; লাতিন, তুর্চিকা-তুর্কী বা তুরস্কদেশীয়)। উক্ত স্থানের অর্বুদ অক্ষিগোলকের পেশী সঞ্চালক স্নায়ুসমূহের অবসাদ ঘটায় এবং অক্ষিগোলক স্থবির হয়ে যায়। ত্রিজ বা ট্রাইজেমিনাল (৫ম করোটি স্নায়ু) স্নায়ুর অবসাদের কারণে মুখাবয়বের অর্দ্ধাংশ অসাড় হয়ে যায়।

(চ) তৃতীয় নিলয়ের অর্বুদ

তৃতীয় নিলয়ের অর্বুদ অবস্থানগত বিচারে তিন প্রকার :—

(১) সম্মুখস্থ—সম্মুখস্থ অর্বুদ ৩য় নিলয়ের মস্তিষ্ক রসসঞ্চালক ছিদ্র

(ফোরামেন্ অব্ মন্‌রো) অবরুদ্ধ ক'রে পার্শ্বনিলয়ের মধ্যে ক্রমনিস্‌স্বয়মান মস্তিষ্করসকে অবরুদ্ধ ক'রে মস্তিষ্কোদক ঘটায়। রোগীর মস্তকে বেদনা, বমন ও ক্রমে দৃষ্টিহানি হয় (ত্রয়ী লক্ষণ)। সামান্য নিম্নদিকে অবস্থিত অর্বুদ নিলয়ের তলদেশস্থ আন্তর্যান্ত্রিক স্নায়ুকেন্দ্রসমূহের উপর চাপ সৃষ্টি ক'রে রোগীকে অজ্ঞান অথবা গভীর নিদ্রাভিভূত করে। কোনও কোনও রোগীর বহুমূত্র রোগ ও প্রবল জর হয়। অর্বুদ আরও নীচে অবতরণ করলে চক্ষুস্নায়ুর কার্যে বাঘাত জনিত দৃষ্টিহানি করে।

(২) পশ্চাতস্থ—পশ্চাতদিকের অর্বুদ থ্যালেমাস নামক বৃহৎ স্নায়ুগ্রন্থির উপর চাপ সৃষ্টি ক'রে রোগীর শরীরে প্রবল বেদনা, পেশীর কম্পন ও দুর্বলতা ঘটায়। শৈশবে রোগাক্রান্ত হ'লে অস্বাভাবিক যৌন-উন্মাদনা হয় এবং পুরুষ রোগীর শিশ্ন প্রাপ্ত বয়স্কের মত বৃহদাকার ধারণ করে (চিত্র ২০)। রোগগ্রস্ত শিশুর বগল ও বিটপে প্রাপ্তবয়স্কের মত কর্কশ ও কুঞ্চিত কেশ বৃদ্ধি হয় এবং তার কণ্ঠস্বর ভঙ্গ হয়। কোনও কোনও রোগী অক্ষিগোলক দুটিকে উপরের দিকে সঞ্চালন করতে পারে না। ক্রমে রোগীর শরীরের ভারসাম্য রক্ষার ক্ষমতা হানি ঘটে ও সুষ্ঠুভাবে বেশী সঞ্চালন ক্ষমতা ব্যাহত হয়।

(ঞ) মধ্যমস্তিষ্কের অর্বুদ (মিডল্ ক্রানিয়াল ফসা টিউমার)

মধ্যমস্তিষ্কের অর্বুদ উপর বা নীচের দিক থেকে উদ্ভূত হয় এবং চক্ষুর পেশী সঞ্চালক স্নায়ুসমূহকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে। মধ্যমস্তিষ্কের মধ্য দিয়ে প্রবাহমান গুরুত্বপূর্ণ স্নায়ুপথগুলি অর্বুদ বিজড়নের ফলে গুরুতর পক্ষাঘাত রোগ হয়।

করোটির নিম্ন প্রকোষ্ঠের অর্বুদসমূহ

(ক) কীট বা ভার্মিস-এর অর্বুদ (লাতিন-ভেরমিস অর্থে কীট বা কেঁচো)

কীট-এ নিলয় কোষ জাত, আদিম গ্লিয়া-কোষজাত, এবং যক্ষ্মাজীবাণুজাত অর্বুদ হয়। অর্বুদ রোগীর দেহের ভারসাম্য হানি করে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের সংহতি নাশ করে। রোগীকে আপাতদৃষ্টিতে মদ্যপ ব্যক্তির মত মনে হয়। গভীর প্রসারী অর্বুদ চতুর্থ নিলয়ের মধ্য দিয়ে মস্তিষ্করস সঞ্চালন ব্যাহত ক'রে মস্তিষ্কোদক সৃষ্টি করে এবং ক্রমে 'ক্রমে ত্রয়ী লক্ষণ প্রকাশ পায়।

(খ) লঘু মস্তিষ্ক গোলার্ধের অর্বুদ (সেরিবেলার হেমিস্ফেরিক্ টিউমার)

লঘুমস্তিষ্ক গোলার্ধের অর্বুদ প্রধানতঃ গ্লিয়া-কোষজাত। শিশুদের মধ্যেই উহা সর্বাধিক পরিলক্ষিত হয় এবং আদিম গ্লিয়া কোষ থেকে উদ্ভূত হয়। এছাড়া তারকা কোষ বা অ্যাস্ট্রোসাইট থেকে উদ্ভূত অর্বুদও একেবারে বিরল নয়। আমাদের দেশে যক্ষ্মা-জীবাণুজাত অর্বুদও প্রচুর দেখা যায়। অর্বুদের ফলে শরীরের ভারসাম্য হ্রাস পায় এবং অঙ্গসঞ্চালনে বিশৃঙ্খলা বা অ্যাটাক্সিয়া (গ্রীক-আটাখিয়া অর্থে বিশৃঙ্খলা) দেখা দেয়। শরীরের পেশীসমূহের তান বা টোন (সং-তান, গ্রীক-টোনস; লাতিন-টোনুস-অর্থে তান বা টান) কমে গিয়ে রোগীকে উত্তরোত্তর দুর্বল ক'রে দেয়। শিশু-রোগীদের মাথা অর্বুদগ্রস্ত গোলার্ধের দিকে হে'লে থাকে। জিহ্বা ও গলবিল-এর পেশীসমূহের তান হানির কারণে রোগী পান করতে বা খেতে গেলে অনবরত বিষম খায়। অর্বুদগ্রস্ত দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করলে অক্ষিগোলক নৃত্য বা নিস্ট্যাগমাস্ (গ্রীক-নিস্টাগেইন অর্থে ঘাড় নারা) দেখা যায়। অর্বুদের ক্রমিক আয়তন বৃদ্ধির ফলে মস্তিষ্করস সঞ্চালন ব্যাহত হয়ে মস্তিষ্কোদক সৃষ্টি করে এবং অবশেষে ত্রয়ী লক্ষণ প্রকাশ পায়।

(গ) **লঘুমস্তিষ্ক—সেতুকোণের অর্বুদ** (সেরিবেল্লোপণ্টাইন অ্যাঙ্গল্ টিউমার; লাতিন পন্স অর্থে সেতু): উক্ত সেতুকোণে বহুপ্রকার অর্বুদ হয়। যার মধ্যে অষ্টম করোটি স্নায়ুর আচ্ছাদনজাত অর্বুদ (অডিটারী-ভেষ্টিব্যুলার নিউরোমা) সর্বাধিক। কোনও এক অজ্ঞাত কারণে উক্ত রোগ মহিলাদের মধ্যে বেশী দেখা যায়। এছাড়া ঐ কোণে ধমনীস্ফীতি বা অ্যানুরিসম এবং যক্ষ্মা-জীবাণুজাত অর্বুদও হয়। রোগী প্রথমে পীড়িত দিকের কানে অস্বাভাবিক শব্দ শুনতে পায় এবং ক্রমে ক্রমে বধির হয়ে যায়। শ্রবণস্নায়ুর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ভারসাম্য রক্ষাকারী স্নায়ুও (ভেষ্টিবুলার নার্ভ) অর্বুদ দ্বারা বিজড়িত হয় এবং রোগী দেহের ভারসাম্য হারায়। অতি সন্নিকটস্থ সপ্তম করোটি স্নায়ু (ফেসিয়াল নার্ভ) আক্ষেপিত হ'লে অর্ধ-মুখাবয়বের পেশীসমূহ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয় (ফেসিয়াল প্যারালিসিস)। উর্ধ্ববিস্তারী অর্বুদ পঞ্চম করোটি স্নায়ুর ("ত্রিজ" বা ট্রাইজেমিনাল নার্ভ) উপর চাপ সৃষ্টি করে এবং মুখাবয়বের অর্ধাংশ অবসাদগ্রস্ত হ'য়ে যায়। অর্বুদ করোটির মধ্য দ্রাঘিমা অতিক্রম করলে

লঘুমস্তিষ্কের কার্যহানি হয়। আরও বর্ধমান অর্বুদ "ত্রয়ী লক্ষণ" প্রকাশ করে।

(ঘ) চতুর্থ নিলয়ের অর্বুদ (ফোর্থ ভেন্ট্রিকল্ টিউমার)

চতুর্থ নিলয়ের ছাদ এবং মেঝে থেকে উদ্ভূত বহু গ্লিয়াকোষজাত অর্বুদ চতুর্থ নিলয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ ক'রে মস্তিষ্ক-রস প্রবাহে ব্যাঘাত ঘটায় ও মস্তিষ্কোদক সৃষ্ট করে। পার্শ্বে অবস্থিত লঘু মস্তিষ্ক গোলার্ধে অর্বুদ প্রসারিত হ'লে, লঘু-মস্তিষ্কের কার্যকারিতা হীনতায় লক্ষণ প্রকাশ পায়।

(৫) মস্তিষ্ক দণ্ডের সম্মুখের অর্বুদ (অ্যান্‌টিরিয়ার বেন্‌ষ্টেম্ টিউমার)

মস্তিষ্ক দণ্ডে সম্মুখস্থ সংকীর্ণ স্থানে আদিম কশেরুকা কোষজাত অর্বুদ (কর্‌ডোমা) ও জালি কোষজাত অর্বুদ (মেনিন্‌জিওমা) দেখা যায়। উক্ত অর্বুদ উপর, নীচ ও পশ্চাতের দিকে প্রসারিত হয়। রোগীর মানসিক বৈকল্যের লক্ষণ দেখা যায় এবা সে অকারণে হাঁসে বা কাঁদে। ধীরে ধীরে হস্ত ও পদ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং সন্নিকটস্থ করোটি স্নায়ুর উপর চাপ সৃষ্টি করে কার্যে ব্যাঘাত ঘটায়।

(৬) মস্তিষ্ক দণ্ডের আভ্যন্তরীণ অর্বুদ (ইন্‌ট্রিন্‌জিক্ টিউমারস্ অব্‌ ব্রেন্‌ষ্টেম্)

উক্ত স্থানে গ্লিয়াকোষজাত অর্বুদের প্রাদুর্ভাব খুব বেশী। আমাদের দেশে যক্ষ্মাজীবাণুজাত অর্বুদও দেখা যায়। সর্বপ্রথম রোগীর অক্ষিগোলকের পার্শ্বপেশী সঞ্চালক ষষ্ঠ করোটি স্নায়ুদ্বয় (অ্যাব্‌ডুসেন্ট নার্ভস) পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়। ফলে রোগী পাশের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করতে পারেনা। ক্রমে ক্রমে নবম করোটি স্নায়ু আক্ষেপিত হয় এবং গলবিলের পেশী সমূহ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়, ফলে রোগী খাদ্য বা পাণীয় গলাধঃকরণ করতে পারে না এবং অনবরত বিষম খায়।

রোগী উপরের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করলে অক্ষিগোলক নৃত্য (ভার্টিক্যাল নিস্‌ট্যাগ্‌মাস্) হয়। দণ্ডের অভ্যন্তরস্থ স্নায়ু প্রবাহ (নার্ভট্রাংকস্) সমূহের উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি হয় এবং হস্ত ও পদের পক্ষাঘাত ও অবসাদ হয়। কিন্তু কোও অজ্ঞাত কারণে অর্বুদ তৃতীয় ও চতুর্থ নিলয়ের সংযোগকারী "সিল্‌ভিউস এর জলপথ"-এর (সিল্‌ভিয়ান অ্যাকুডাকট্) উপর চাপ সৃষ্টি করে না এবং যার জন্য মস্তিষ্ক রস প্রবাহের কোনও ব্যাঘাত সচরাচর ঘটে না।

মেরুমজ্জা বা সুষুম্নাকাণ্ডের অর্বুদ

মেরুমজ্জাতেও মস্তিষ্কের ন্যায় অর্বুদ গজায় এবং হাত ও পদের বিভিন্ন প্রকার পক্ষাঘাতরূপে অভিব্যক্ত হয়। মস্তিষ্কের অর্বুদের অনুপাতে মেরুমজ্জার অর্বুদ বিরল। নিদানতাত্ত্বিক বিচারে উহা—

(১) মাতৃসমা জালিকোষ (অ্যারাখ্‌নয়েড) জাত বা মেনিন্‌জিওমা।

(২) স্নায়ুরজ্জু আবরণী কোষজাত বা নিউরোমা।

(৩) মজ্জার অন্তস্থ ধূসর বা শ্বেত উপাদানের গ্লিয়া কোষসমূহ জাত বা গ্লিওমা।

(৪) মজ্জার শিরা ও ধমনী প্রভৃতি হইতে উদ্ভূত বা অ্যান্‌জিওমা।

ইহা ব্যতীত কশেরুকার অস্থি থেকে উদ্ভূত অর্বুদ ও অন্যান্য স্থানের ভীষণধর্মী অর্বুদ হইতে বিক্ষিপ্ত অর্বুদসমূহও মেরুমজ্জার ক্ষতিসাধন করতে পারে। যক্ষ্মা-রোগজীবাণু জাত ফোঁড়া থেকেও মেরুমজ্জা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

প্রাচীনকাল থেকে চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা মেরুমজ্জাজাত পক্ষাঘাত রোগের কারণ ও রোগের শারীরস্থানগত অবস্থান নির্ণয়ের জন্য সচেষ্ট ছিলেন। কেবলমাত্র রোগলক্ষণ বিচারে করে তাঁরা অভিমত দিতেন। রোণ্টগেন রশ্মি আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে পৃষ্ঠকাশের রোণ্টগেন চিত্রের সাহায্যে বহু অর্বুদের স্থান নিরূপণ সহজসাধ্য হয়েছিল। পরবর্তীকালে ফরাসী চিকিৎসক সিকার্দ ও ফোরেস্তিয়ে মেরুমজ্জার মধ্যে লিপায়োডল নামক আইয়োডিন মিশ্রিত তৈল সূচিকাবিদ্ধ করে রোণ্টগেন রশ্মির সাহায্যে "সুষুম্না চিত্রণ" বা মাইয়েলোগ্রাফী পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। মৌলিক পদার্থ আইয়োডিনের মধ্যে দিয়ে রোণ্টগেন রশ্মি প্রবাহিত হয় না সেইজন্যই উক্ত পদ্ধতি সফল হয়েছে। ক্রমে ক্রমে আরও নূতন নূতন রাসায়নিক পদার্থ আবিষ্কারের ফলে এবং মাইয়েলোগ্রাফী করণে দূরদর্শন (টি·ভি·) প্রযুক্তি করায় উক্ত পদ্ধতি অতীব সহজসাধ্য হয়েছে। মস্তিষ্কের অর্বুদের মত মেরুমজ্জার অর্বুদের চিকিৎসায় বর্তমানে শল্য চিকিৎসাই প্রধান উপায়। উক্ত শল্য চিকিৎসাতেও মস্তিষ্ক শল্য চিকিৎসায় ব্যবহৃত যন্ত্রাদি প্রয়োগ করা হয়। মস্তিষ্ক ও মেরুমজ্জার চিকিৎসায় শল্য চিকিৎসালব্ধ অর্বুদের অংশবিশেষ অণুবীক্ষণ পরীক্ষার পর যদি ভীষণধর্মী অর্বুদ বলে প্রতিপন্ন হয় তাহা হলে শল্যচিকিৎসোত্তর আরও বিভিন্ন প্রকার চিকিৎসার অবশ্য প্রয়োজন।

ভীষণধর্মী অর্বুদের চিকিৎসায় গভীরপ্রসারী রোণ্টগেন রশ্মি প্রয়োগ বা

ডীপ-এক্সরে থেরাপী প্রথার প্রবর্তন করেছিলেন ভিয়েনার র‍্যোণ্টগেন রশ্মি প্রযুক্তিবিদ্ গিদো হোলৎস্‌ক্নেথট্ তিনি উক্ত রশ্মির বিষক্রিয়ার ফলে মৃত্যুবরণ করেন এবং র‍্যোণ্টগেন রশ্মি বিজ্ঞানের প্রথম শহীদ হন। র‍্যোণ্টগেন রশ্মি মধ্যস্থ "গামা" রশ্মি ভীষণধর্মী অর্বুদের কোষসমূহ ধ্বংস করে নিরাময় করে। সেইজন্য গামারশ্মি বিচ্ছুরণকারী সমঘর পদার্থ প্রয়োগ দ্বারাও ভীষণধর্মী অর্বুদের চিকিৎসা করা হয়। বর্তমানে আবিষ্কৃত "কর্কট কোষকেন্দ্র বিধ্বংসী" (সাইটোটক্সিক্ ড্রাগ্) রাসায়নিক পদার্থের দ্বারাও অর্বুদের চিকিৎসা করা হয়। কোনও কোনও ভীষণধর্মী অর্বুদ সক্রিয়ভাবে অনাক্রম্য পদার্থ (ইমিউনোজেন) ক্ষরণে সক্ষম হয়। ফলে বহু ভীষণধর্মী অর্বুদ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিলীন হয়। উক্ত আশ্চর্যজনক তথ্যের উপর ভিত্তি করে বর্তমান নিদানতাত্ত্বিকগণ ভীষণধর্মী অর্বুদের ভেষজ চিকিৎসার মানসে উক্ত অনাক্রম্য পদার্থ সমূহের সন্ধানে চিত্তবিনিয়োগ করেছেন। যদি তাঁদের প্রচেষ্টা সফল হয় তাহ'লে মনে হয় যে অদূর ভবিষ্যতে স্নায়ুমণ্ডলী তথা সমগ্র মানবদেহের অর্বুদের চিকিৎসায় শল্য চিকিৎসা প্রযুক্তি ক্রমশঃ নিষ্প্রয়োজন হয়ে যাবে।

সুষুম্না কাণ্ডের অর্বুদ অপসারণ ঃ

নিদানতাত্ত্বিকেরা পরামর্শ দিতেন যে মস্তিষ্কের অর্বুদের ন্যায় সুষুম্না এবং পৃষ্ঠবংশ এর অর্বুদও শল্য চিকিৎসার দ্বারা অপসারণ যোগ্য। কিন্তু ক্ষতদূষণের ভীতিই তাঁদের অস্ত্রপ্রচার থেকে বিরত করত। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ভিকটর হর্স'লে (৪২) নামক এক ইংরাজ তরুণ শল্য চিকিৎসককে লণ্ডনের বিখ্যাত স্নায়ু শাস্ত্রবিদ উইলিয়াম গাওয়ার্স' (৩৭) একটি রোগী দেখতে আমন্ত্রণ জানান। সেই মধ্য বয়স্ক রোগী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সেনা বাহিনীতে চাকরী করত। তিন বৎসর পূর্বে তার পৃষ্ঠবংশের প্রায় মাঝামাঝি একস্থানে বেদনা আরম্ভ হয় এবং মাত্র তিন মাসের মধ্যে সে চলৎশক্তি রহিত হয়ে পরে। পূর্বে উল্লিখিত মেসওয়েন (৪৭) ঐ ঘটনার বেশ কিছুকাল পূর্বে সফলতার সঙ্গে ২ টি সুষুম্নার অর্বুদ অপসারণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলে লিখিত আছে। তরুণ হর্স'লে গাউয়ার্সে'র রোগীর দেহে অস্ত্রপচার করতে রাজী হন এবং অর্বুদটি অপসারণেও সক্ষম হন। রোগী পুনরায় চলৎশক্তি ফিরে পায়। হর্স'লে অতঃপর স্নায়ুতন্ত্রের শল্য চিকিৎসায় একান্তভাবে মনোনিবেশ করেন। তিনিই বর্তমানকালের প্রথম প্রকৃত স্নায়ু শল্যচিকিৎসক। তাঁর সমসাময়িককালে মার্কিণ দেশের বোষ্টন

শহরের অপর এক শল্যচিকিৎসক স্নায়ু শল্যচিকিৎসায় অনুরাগী হন। তাঁর নাম হার্ভে কুশিং (২৫)। তিনি বর্তমানের স্নায়ুশল্য চিকিৎসাশাস্ত্রের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন করেন। তাঁর সুযোগ্য সহযোগী ওয়াল্টার ডাণ্ডি মস্তিষ্কের অর্বুদের সঠিক স্থান নিরূপণের "নিলয়চিত্রণ' বা ভেন্ট্রিকিউলোগ্রাফী পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। পরবর্তীকালে পর্তুগীজ স্নায়ুশাস্ত্রবিদ এগাজ মোনিজ, হাসেক্ ও লিণ্ডেনথাল নামক দুই ভিয়েনাবাসী শারীরস্থানবিদের গবেষণা অনুসরণ করে মস্তিষ্কের "ধমনী-শিরা চিত্রণ" বা সেরিব্রাল এ্যানজিওগ্রাফী এর উপায় উদ্ভাবন করেন। সমসাময়িককালে সিকার্দ ও ফরেষ্টিয়ে নামক দুই ফরাসী চিকিৎসকের প্রচেষ্টায় 'সুষুম্না চিত্রণ" বা মায়েলোগ্রাফী করা সম্ভব হয়। অবশ্যই স্বীকার্য যে ঐ সকল পরীক্ষা উদ্ভাবন হ্বিলহেল্ম্ রোন্টগেন্ কর্তৃক রঞ্জন রশ্মি আবিষ্কার ও চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁর বিজ্ঞান সম্মত প্রয়োগের ফলেই সম্ভব হয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর স্নায়ুশল্য শাস্ত্রের অভাবনীয় উন্নতি হয়েছে। ফ্লেমিং ও তাঁর সহযোগীদের দ্বারা "পেনিসিলিন" নামক জীবাণু নিরোধক আষ্কিবারের ফলে অস্ত্রপচারের পরবর্তী জীবাণু সংক্রমণ প্রশমিত করা সম্ভব হয়েছে এবং ক্রমে ক্রমে আরও নূতন নূতন জৈব জীবাণু নিরোধক আবিষ্কৃত হয়ে মস্তিষ্কে অস্ত্রপচার আরও সহজসাধ্য ও নিরাপদ হয়েছে। অবচেতন শাস্ত্রেরও সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হয়েছে এবং সেই সঙ্গে রক্তক্ষরণ রোধের জন্য বিবিধ ঔষধ ও পদ্ধতি আবিষ্কারের ফলে রোগীর মৃত্যুর হার ক্রমশঃ নিম্নাভিমুখী হয়ে গিয়েছে।

অর্বুদের অবস্থান নির্ণয় পদ্ধতির ক্রমবিবর্তন

অতি প্রাচীনকাল থেকে চিকিৎসকগণ কেবলমাত্র রোগ লক্ষণ নিরীক্ষণ করে মস্তিষ্কের অর্বুদ এর রোগের নির্ণয়ণ ও স্থান নিরূপণ করতে চেষ্টা করতেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্থান নিরুপণ ভুল প্রতিপন্ন হত। বিগত শতাব্দী থেকে বিজ্ঞানের উত্তোরোত্তর উন্নতির সঙ্গে নির্ণয়ণে সাফল্য আশাতীতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৮৯৫ অব্দে জার্মাণ পদার্থবিদ কোন্‌রাড রোন্টগেন অদৃশ্য রোন্টগেন রশ্মি আবিষ্কার করেন। উক্ত আবিষ্কারের অব্যবহিত কাল পরে ভিয়েনার স্নায়ুতত্ত্ববিদ আর্থার স্থালের এক রোগীর মস্তকের সাধারণ রোন্টগেন চিত্রের সাহায্যে মস্তিষ্কের অর্বুদের স্থান নিরুপণে সক্ষম হন। উক্ত অভাবনীয় সাফল্যের জন্য স্থালের আজও "স্নায়ু-রোন্টগেন শাস্ত্রের জনক" বলে সম্মানিত

হন। ক্রমে ক্রমে র‍্যোণ্টগেন রশ্মি প্রযুক্তির আরও উন্নতি হয় এবং আরও বহুবিধ নূতন নূতন অর্বুদ নিরূপণ পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়।

আমেরিকার বিখ্যাত স্নায়ু শল্যচিকিৎসক ওয়াল্টার ডাণ্ডি মস্তিষ্ক নিলয় সমূহকে বায়ু অথবা নিষ্ক্রিয় বাষ্প দ্বারা পূর্ণ করে র‍্যোণ্টগেন রশ্মি সাহায্যে "নিলয় চিত্রণ" বা ভেন্ট্রিকিউলো-গ্রাফী নামক এক অভিনব পদ্ধতি আবিষ্কার করেন (চিত্র ২৫, ২৬)। পরবর্তীকালে পর্তুগালবাসী স্নায়ুতত্ত্ববিদ্ এগাজ্ মোনিজ মস্তিষ্কের অভ্যন্তরস্থ ধমনী ও শিরাচিত্রণের অভিনব র‍্যোণ্টগেন পদ্ধতি মস্তিষ্কের "ধমণী-শিরা চিত্রণ" বা সেরিব্রাল অ্যানজিওগ্রাফী আবিষ্কার করেন (চিত্র ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২)। যার ফলে অর্বুদের স্থান নিরূপণ আরও সহজ সাধ্য হয়।

নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত ওলন্দাজ বিজ্ঞানী ভিলেম্ আইনথোভেন কর্তৃক অতি ক্ষীণ বিদ্যুৎপ্রবাহ অন্ববেক্ষণকারী যন্ত্র "ষ্ট্রিং গ্যাল্‌ভানোমিটার" আবিষ্কারের পর জার্মাণ স্নায়ুতাত্ত্বিক হানস্ বেরগের ঐ যন্ত্র সাহায্যে মস্তিষ্কের স্বতঃ প্রবাহিত বিদ্যুৎ তরঙ্গ নিরূপণে সক্ষম হন এবং "মস্তিষ্ক বিদ্যুৎ লিখন" বা ইলেক্ট্রো এন্‌সেফালোগ্রাফীর পদ্ধতি প্রচলিত করেন। উক্ত পরীক্ষার দ্বারাও মস্তিষ্কের অর্বুদের স্থান নিরূপণ করা যায় (চিত্র ৩৩)।

নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত মার্কিণ বিজ্ঞানী আরনেষ্ট ওরলাণ্ডো লরেন্স পরমাণু বিচূর্ণকারী "সাইক্লোট্রণ" নামক এক যন্ত্র উদ্ভাবন করেছিলেন। যন্ত্রটির সাহায্যে বহু মৌলিক পদার্থের "সমঘর" বা আইসোটোপ প্রস্তুত করা যায়। কোনও কোনও বিশেষ সমঘর পদার্থ মস্তিষ্কের অর্বুদ গ্রস্ত রোগীর শিরায় সূচিকাবিদ্ধ করলে উক্ত অর্বুদের কোষ মধ্যে রাশীকৃত হয় এবং গামা রশ্মি বিচ্ছুরণ করতে থাকে। গামারশ্মি নির্ণয়কারী যন্ত্রের সাহায্যে উক্ত অর্বুদের সঠিক স্থান নিরূপণ আজ অতি সহজসাধ্য। উক্ত পদ্ধতি "গামা সিন্‌টিগ্রাফী" নামে অধুনা সুপ্রচলিত (চিত্র ৩৪, ৩৫)। ডুসিক ও ডুসিক নামক দুই ভিয়েনাবাসী বৈজ্ঞানিক ভ্রাতৃদ্বয় সর্বপ্রথম "শ্রবণাতীত শব্দতরঙ্গ" বা আলট্রাসোনিক তরঙ্গ সাহায্যে মস্তিষ্কের অর্বুদের স্থান নির্ণয়ে সমর্থ হন। পরবর্তীকালে সুইডীয় লেক্সেল নামক স্নায়ু শল্যবিদ্ উক্ত পদ্ধতির প্রভূত উন্নতি সাধন করে বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞানে "আলট্রাসোনোগ্রাফী" নামক এক নূতন রোগ নির্ণয় বিজ্ঞানের অধ্যায়ের সূচনা করেছেন যার ফলে সর্বাঙ্গের আন্তর যন্ত্রাদির রোগ নির্ণয় অতি সহজ সাধ্য হয়েছে (চিত্র ৩৬)।

বিংশ শতকে মস্তিষ্কের অর্বুদের নির্ণয় পদ্ধতিতে যুগান্তর আনয়নকারী আবিষ্কার গাণনিক "স্তরচিত্রণ" বা কম্প্যুটার টোমোগ্রাফী (সি. টি. স্ক্যানিং) ডঃ অ্যালান করমাক নামক মার্কিন পদার্থবিদ্যাবিদ ও গডফ্রে হাউন্‌সফিল্ড নামক ইংরাজ যন্ত্রশিল্পী উক্ত পদ্ধতি আবিষ্কার করে ১৯৭৯ অব্দে নোবেল পুরস্কারে বিভূষিত হয়েছেন। উক্ত পরীক্ষায় রেন্টগেন রশ্মি সাহায্যে স্তরে স্তরে মস্তিষ্কের চিত্র গ্রহণ ও গাণনিক যন্ত্র বা কম্প্যুটারের সাহায্যে তাহা বিশ্লেষণ করে অর্বুদের আকৃতি, প্রকৃতি ও স্থান নিরুপণ করা আরও সাবলীল হয়েছে (চিত্র ৩৭, ৩৮)।

পরবর্তী আবিষ্কার "কেন্দ্রিক চৌম্বক স্তর চিত্রণ" বা নিউক্লিয়ার ম্যাগনেটিক রেসোনান্স টমোগ্রাফী নামে পরিচিত। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত মার্কিন বৈজ্ঞানিক এডওয়ার্ড পারসেল ও স্থইস্ বৈজ্ঞানিক কোন্‌রাড ব্লখ্ এর সতন্ত্র গবেষণার ফলে উক্ত অভিনব পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছে। উক্ত পরীক্ষা ব্যবস্থায় অতিশক্তিশালী চৌম্বক শক্তির সাহায্যে লওয়া হয় এবং গাননিক যন্ত্র সাহায্যে চিত্রের ব্যাখ্যা করা হয় (চিত্র ৩৯)।

সর্বাধুনিক পরীক্ষাটির নাম "ধন-বিদ্যুৎ বিচ্ছুরী স্তর চিত্রণ" বা পজিট্রন এমিসান্ টমোগ্রাফী। ইহা 'সমঘর' সাহায্যে মস্তিষ্কের পরীক্ষার এক নূতনতম বিকাশ। এই পরীক্ষায় ধন-বিদ্যুৎ বিচ্ছুরণকারী "সমঘরের" সাহায্যে মস্তিষ্কের স্তর চিত্রণ করা হয় এবং গাননিক যন্ত্র সাহায্যে ব্যাখ্যাকৃত হয় (চিত্র ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫)।

মস্তিষ্কের বর্তমান অত্যাধুনিক শল্য চিকিৎসা যন্ত্রাদি

রোগ নির্ণয় পদ্ধতির ক্রম উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের শল্য চিকিৎসা যন্ত্রাদিরও প্রভূত উন্নতি হয়েছে। বর্তমানের সাধারণ ছুরিকা ছাড়াও মস্তিষ্কের অস্ত্রপচারের নানা প্রকার অভিনব যন্ত্রাদি ব্যবহৃত হয়। অস্ত্রপচারের সময় রক্তক্ষরণ রোধের জন্য।

(১) তাপীয় বৈদ্যুতিক তরঙ্গ (ডায়াথার্মী কারেন্ট)

(২) অতি শৈত্য উৎপাদক ফলাকা (ক্রায়োপ্রোব) এবং

(৩) লেসার রশ্মি প্রয়োগ করা প্রভৃতি বহুল প্রচলিত হয়েছে।

মস্তিষ্কের অর্বুদ নিষ্কাশনের জন্য শব্দাদিতরঙ্গ সাহায্যে উহাকে চূর্ণবিচূর্ণ করা যায় এবং অতি সহজে শোষণ করিয়া বাহির করা যায়। উক্ত প্রয়োগ যন্ত্রটি "কুসা" নামে পরিচিত।

বর্তমান ভারতের স্নায়ু শল্য চিকিৎসা ঃ

ভারতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বকাল ও তৎপূর্ববর্তী কালে বহু য়ুরোপীয় চিকিৎসক পরিব্রাজকের মানসে ভারতে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ভারতে বসবাস করতে আরম্ভ করেন এবং তৎকালীন য়ুরোপে প্রচলিত পদ্ধতিতে চিকিৎসা ব্যবসায় করতে থাকেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠিত হবার পর বহু ইংরাজ চিকিৎসক ভারতে এসেছিলেন এবং কালক্রমে ভারতের ব্রিটিশ অধিপত্যাধীন স্থানে ছোট ছোট হাসপাতালও খুলে ছিলেন। সেই হাসপাতালগুলির মধ্যে শেঠ সুখলাল কারনানী স্মৃতি হাসপাতাল (পূর্বতন প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাসপাতাল) ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়েছিল। সর্বপ্রথম পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারকারী মেডিকেল কলেজ ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় স্থাপিত হয় এবং ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজে অপর মেডিকেল কলেজ ও ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই শহরেও অনুরূপ মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কতিপয় সাহসী শল্য চিকিৎসক মামুলী শল্য চিকিৎসা ছাড়াও মস্তকের শল্যচিকিৎসায় অগ্রণী হয়েছিলেন। ঐতিহাসিক বিবরণে জানা যায় যে কর্ণেল অ্যাণ্ডারসন নামক এক ইংরাজ শল্য চিকিৎসক মাদ্রাজে সর্বপ্রথম মস্তকের একটি অর্বুদের অস্ত্রপচার করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজের শল্যচিকিৎসা বিভাগের প্রধান হন এবং কলিকাতা শহরেই পরিণত বয়সে তাঁর দেহাবসান ঘটে। গিণ্ডে (৩৫) প্রণীত এক বিবরণী থেকে জানা যায় যে বোম্বাই এর বাচা, দেশমুখ, কুপার ও বালিগা মস্তকের শল্য চিকিৎসায় উদ্যোগী হয়েছিলেন। বাগচীর (৪) বিবরণী থেকে জানা যায় যে, নরসিংহম, বিশ্বনাথ মেনন, মোহন রাও ও বালকৃষ্ণ রাও, কলিকাতার অ্যাণ্ডারসন, সান্যাল ও মুখার্জী, অমৃতসরের মিরাজকার ও বলদেব সিং ইত্যাদি সকলেই অল্প বিস্তর মস্তকের শল্য চিকিৎসা করতেন।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ভারতের স্বাধীনতালাভের পর সরকার দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থার আধুনিকীকরণে উদ্যোগী হন। বিশুদ্ধ স্নায়ুশল্য চিকিৎসা বিদ্যায় শিক্ষিত শল্য চিকিৎসক জেকব্ চাণ্ডি ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে কানাডার মনট্রিল শহরে অবস্থিত নিউরোলজিক্যাল ইনষ্টিটিউটে পেনফিল্ডের তত্ত্বাবধানে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে তামিলনাড়ুর ভেল্লোর শহরে অবস্থিত খৃষ্টীয় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যোগদান করেন। তাঁর পরবর্তীকালে রামমূর্তি, গিণ্ডে, বাগচী ও দয়ানন্দরাও

যথাক্রমে মাদ্রাজ, বোম্বাই, কলিকাতা ও হায়দ্রাবাদে মস্তিষ্ক ও স্নায়ুশল্য চিকিৎসা করতে আরম্ভ করেন। বাগচী ভিয়েনার প্রখ্যাত স্নায়ুশল্য চিকিৎসক স্খোন্‌বাউয়ের ও ক্রাউসের ছাত্র। পশ্চিমবঙ্গের পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় বাগচী ও ক্রাউসকে কলিকাতায় আমন্ত্রণ করে আনেন এবং ক্রাউস, বাগচী, ও চ্যাটার্জী কলিকাতার তথা সারা পূর্বভারতের সর্বপ্রথম স্নায়ুশল্যচিকিৎসা সংস্থার গোড়াপত্তন করেন। তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বহু আগ্রহী শল্যচিকিৎসক স্নায়ুশল্য চিকিৎসায় প্রশিক্ষণ লাভ করেন এবং ভারতের বহু শহরে স্নায়ু শল্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়। বর্তমানে ১৮০ জনেরও অধিক স্নায়ুশল্য চিকিৎসক ভারতে কর্মরত আছেন। ইতিমধ্যে কলিকাতা, বাঙ্গালোর ও মাদ্রাজে একটি করিয়া স্নায়ুশাস্ত্র মহাবিদ্যালয় বা বা নিউরোলজিক্যাল ইনষ্টিটিউট স্থাপিত হয়েছে। বর্তমানের নবীন শল্য চিকিৎসকেরা আধুনিক যন্ত্রপাতি ও উন্নত প্রযুক্তিকলার সাহায্যে পৃথিবীর অন্যান্য সুসভ্য দেশে প্রচলিত বহু প্রকার অতি দুরূহ শল্য প্রক্রিয়া সফলতার সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন। ভারতের ৭০ কোটি লোক সংখ্যার জন্য মাত্র ১৮০ জন স্নায়ু শল্য চিকিৎসক যৎসামান্য বললেও অত্যুক্তি হয় না কেন না সংখ্যানুপাতে প্রায় ৪০ লক্ষ ব্যক্তির জন্য মাত্র একজন স্নায়ুশল্য নিযুক্ত আছেন!

তথ্যের সূত্র

1. ANDRAL, G.—The Clinique' Medicale or Reports of Medical Cases, etc., translated by D. Spillan, Xiii + 1014 pp. H Benshaw, London. 1836.
2. ARETAEUS—The Extant Works of Aretaeus the Cappadocian, edited and translated by F. Adams, XX + 501 pp. Sydenham Society, London, 1856.
3. AURELIANUS, C.—Acute Diseases and Chronic Diseases, edited and translated by I. E. Drabkin, 1019 pp. University of Chicago Press, 1950.
4. BAGCHI, A. K.—The Development of Neurosurgery in India, *Ind. Med. Gaz.* (*Annual*), 19-22, 1964.
5. Idem.—Snāyu Salya Chikitsār Kramavikās, *Chikitsa Jagat*, 6, 10-12, 1964.
6. Idem.—Susruta—A Man of History and Science, *Internat. Surg.* 50, 403-407, 1968.
7. Idem.—Indian Influences on Aarbic and Moorish Medicine, *Phronesis*, 47, 3-9, 1978.
8. Idem.—Sanskrit and Modern Medical Vocabulary : A Comparative Study, Riddhi India, Calcutta, 1978.
9. Idem.—Chikitsā Sāstra Yuge Yuge, West Bengal Book Board, Calcutta, 1983.
10. BALLANCE, C.A.—The Thomas Vicary Lecture : Glimpse into the History of the Surgery of the Brain (delivered before the Royal College of Surgeons of England on Decemder 8, 1921), iv + 110 pp. The Macmillan Company, London, 1922.
11. BARTHOLOW, R.—Experimental investigations into the functions of the human brain. *Amer. J. Med. Sc.* (*n.s*) 67 : 305-313, 1874.

12. BENNETT, A.H. AND GODLEE R. J,—Excision of a tumour from R. J. the brain. *Lancet*, 2: 1090-1091, 1884.

13. BERENGARIUS, J.—De Fractura Cranil Liber Aurens, Edito Nova, ab Innumeris Mendis Vindicata, 355 pp. H. Teering, Lugduni Batavorum, 1728.

14. BICHAT, X.—Anatomie Generale Appliquee a la Physiologie et a la Medicine (4 vols.) Vol. 1, CXII+ 244 pp. Brosson, Gabon & Cie, Paria. 1801.

15. BLUM, F.—Der Formaldehyd als Hartungsmittel, *Ztschr. Wissensch. Mikr*, 10 : 314-315-1893.

16. BOUILLAUD, J.—Recherches cliniques propres a demontrer que la perte de la parole correspond a la lession de lobules anterieure du cerveau et a confirmer l' opinion de M. Gall sur le siege de l' organe du langage articule. *Arch. gen. med.*, 8 : 25-45, 1825.

17. BRAMWELL, B.—Intracranial Tumours, XV+270 pp. Y. J. Pentland, Edinburgh, 1888.

18. BRAVAIS, L. F.—Recherches sur les symptomes et le traitement de l' epilepsie hemiplegique. These No. 118, Paris 1872.

19. BREASTED, J. H.—The Edwin Smith Surgical Papyrus (published in facsimile) and hieroglyphic transliteration with translation and commentary in 2 vols.) Vol. 1, VXIV+596 pp., 8 pl. University of Chicago Press, Chicago, 1930.

20. BREWITT-TAYLOR, C. H.—San Kuo, or Remance of the Three Kingdoms (2 vols.), Vol. 1638 pp., Vol. 2, 623 pp. Kelly & Walsh, Ltd., Shanghai, Hong Kong, Singapore, 1925.

21. BROCA, P.—Sur les trepanations prehistoriques. *Bull et mem. Soc. anthropol.* Paris, 25 : 542-457, 1874.

22. BROWNE, E. G.—Arabian Medicine, Being the Fitzpatrick Lectures Delivered at the College of Physicians in November 1919 and November 1920. VIII+138 pp. Cambridge University Press, Cambridge, England, 1921.

23. BRUNUS.—Chirurgia magna. In *Collectio Chirurgica Veneta*, pp. 83-102. 1498.

24. CELSUS, A. C.—De Medicina, translated by W. G. Spencer, Vol. 3, pp. 294-649 W. Heineman, Ltd., London, 1938.

25. CUSHING, H.—The special field of neurological surgery after another interval. *Arch. Neurol. & Psychiat.*, 4 : 603-637, 1920.

26. DAX, M.—Lesions de la moitie gauche de l' encephale coincidant avec l' oubli de la pensee. *Montpellier med.*, 38 : 233-237, 1877.

27. DE MONDEVILLE, H. Chirurgie de Maitre Henri de Mondeville, translated by E. Nicaise, LXXII+903 pp. G. Bailliere & Cie., Paris, 1893.

28. DURANTE, F.—Contribution to endocranial surgery. *Lancet*, 2 : 654-655, 1887.

29. EARLE, K.M., BALDWIN, M., AND PENFIELD, W. Incisural selerosis and temporal lobe seizures produced by hippocampal herniations at birth. *Arch. Neurol & Psychiat.*, 69 : 27-42, 1953.

30. FLOURENS, P.—Recherches experimentales sur les Proprietes et les Fonctions du Systeme nerveus

dans les Animaux vertebres, XXVI+332 p. Crevot, Paris, 1824.

31. FRITSCH, G., AND HITZIG, E.—Ueber die elektrische Erregbarkeit des Grosshirns. *Arch. Anat. Physiol. u. Wissensch. Med.* 37 : 300-332, 1870.

32. GALEN, C.—Oeuvres Anatomiques, Physiologiques et Medicales de Galen, Vol. 1, XVI+709 pp. Vol. 2, 786. pp. J. B. Bailliere, Baris, 1854.

33. GALL, F. J. AND SPURZHEIM, J.—Anatomie et Physiologie du Systeme Nerveux en general et du Cerveau en particular, Vol, xxxviii+248 pp. F. Schoell, Paris, 1810.

34. GERLACH, J.—Mikroskopische Studien aus dem Gebiete der menschlichen Morphologie VI+72 pp. Enke, Erlangen, 1858.

35. GINDE, R. G.—History of Neurosurgery in India, *J. Ind. Med. Prof.*, 1 : 81-84, 1954.

36. GOLGI. C.—Sulla fina Anatomia degli Organi centrali del Sistema nervoso, 214 pp. Hoepli, Milan, 1886 (1885).

37. GOWERS, W. R. AND HORSLEY, V. A.—Case of tumour of the spinal cord ; removal ; recovery *Med. Chir Tr.*, 71 : 377-430, 1888.

38. GRANA, F, ROCCA, E. D., AND GRANA, L. R.—Las Trepanaciones Craneana en el Peru en la Epoca Pre-Hispanica, 340 pp. *Imprent Santa Maria*, Lima, 1954.

39. GUY DE CHAULIAC.—On Wounds and Fractures, translated by W. A. Brennan XII+154 pp. Privately printed, Chicago, 1923.

40. HIPPOCRATES.—The Genuine Works of Hippocrates, translated by F. Adams. V+366 pp. Wm. Wood & Company, New York, 1829.

41. HIRSCHFFELDER, J. O—Removal of a tumour of the brain. *Pacific M. & S. J.* 29 : 210-216, 1886.

42. HORSLEY, V., TAYLOR, J. AND COLEMAN, W. S.—Remarks on the various surgical procedures devised for the relief or cure of trigeminal neuralgia (tic. douloreux) *Brit. Med. J.* 2 : 1139-1143, 1191-1193, 1249-1252, 1891.

43. JACKSON, H. H.—Discussion of paper by A. H. Bennett and R. J. Godlee. Case of cerebral tumour; the surgical treatment. *Brit. Med. J.* 1 : 988-989, 1885.

44. JACKSON, J. H.—Selected Writings, edited by J. Taylor, G. Holmes, and F.M.R. Walshe, Vol. 1, XIV+500 pp. Hodder & Stoughton, Ltd, London, 1931.

45. KEEN, W. W.—Three successful cases of cerebral surgery including (1) the removal of a large intracranial fibroma, (2) exsection of damaged brain tissue and (3) excision of the cerebral centre for the left hand; with remarks on the general technique of such operations. *Amer. J. Med. Sc.*, 96 : 329-357, 1888.

46. LISTER, J.—On the antiseptic principle in the practice of surgery. *Lancet*, 2 : 353-356, 1867.

47. MACEWEN, W—Discussion of paper by A.H. Bennett and R. J. Godlee. Case of cerebral tumour; the surgical treatment. *Brit. Med. J.* 1 : 988-989, 1885.

48. MARCHI, V, AND ALGERI—Sulle degenerazioni discendenti della cortccia cerebrale. *Riv. sper freniat*, 11 : 492-424, 1885.

49. MORGAGNI, G. B.—De sedibus et causis morborum, (8 vols.,) Vol. 1, 629 pp. M. C. Compere, Jr., Lutetiae, 1820.

50. MORTON, S. G.—Crania Americana, Or a Comparative View of the Skulls of various Aboriginal Nations of North and South America, V+296 pp. J. Dobson, Simpson, Marshall & Company, Philadelphia, 1839.

51. NEEDHAM, J.—Science and Civilisation in China ; Vol. 1. Introductory Orientations, Vol. 1, XXXVIII +318 pp. Cambridge University Press, Cambridge, England, 1954.

52. NISSL, F.—Ueber die Veranderungen der Ganglienzellen am Fascialiskern des Kaninchens nach Ausreissung der Nerven. *Allg. Ztschr. Psychiat*, 48 : 197-198, 1892.

53. PARDAL, R.—Madicina Aborigen Americana, 377 pp. *J. Anesi*, Buenos Aires 1937.

57. PARE, A.—Oeuvres Completes d' Ambroise Pare, translatede by J.F. Matgaigne, 811 pp. J.B. Bailliere, Paris, 1840.

58. PAUL OF AEGINA.—The Seven Books of Paulus Aegineta, translated by F. Adams (3 vols) Vol. 1, XXVVIII+683 pp, Vol. 2, ix+511 pp. Sydenham Society, London, 1844.

59. PRUNIERES, P. B.—Sur les objects de bronze, ambre, verre, etc. meles aux silex et sur les races

humaines dont on trouve les debris dans les dolmens de la Lozere. *Compt. rend. Assoc. franc. avanc. sc.*, 2 : 683-705, 1873.

60. RHAZES.—Opera Parva Abubetri Filli (Zachariae Filli Arasi) que in hoc Parvo Volumine, Continentur Sunt, 284 pp. 7 11 *J. de Farrarris, Lugduni*, 1511.

61. ROLANDO, L.—Saggio sopra la vera Struttura del Cervello delluomo e degl Animali sopra le Funzioni del Sistema Nervoso, xiv+98 pp. Stampa Privilegiata, Sassari, 1809.

62. SCHIMMELBUSCH, C.—Die Durchfuehrung der Asepsis in der Klinik des Herrn Geheimrath von Bergmann in Berlin. *Arch. Klin. Chir*, 42-123-171, 1891.

63. SIEGERIST, H. E.—A History of Medicine ; Primitive and Archaic Medicine, Vol. 1, XX1+564 pp. Oxford University Press, New York, 1951.

64. SINGHJEE, SIR B.—A short history of Aryan Medical Science, 1st Ed. Macmillan London, 1896.

65. SOEMMERING, S. T.—Ueber das Organ der Seele. F. Nicolovius, Koenigsberg, 1796.

66. STENSEN, N.—A Dissertation on the Anatomy of the Brain, by Nicolaus Steno, Read in the Assembly in M. Thenenot's House in the Year 1665, XIV+60 pp.+50 pp. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, Copenhagen, 1950.

67. THEODORIC.—Incipt Cyrurgia edita et compilata a divino Theodorico Episcopo Cerviensi Ordinis Praedicatorunm. In Cyrurgia Guidonis de Cauliaco, by Guy de Chauliac, pp. 97-134. Vetetiis, 1499.

68. VESALIUS, A. – Opera omnia anatomica et chirurgica, Vol. 1, 16 11. 572 pp. Vol. 2, 3 11., 577-1156 pp. 26 11 du Vivie & J. H. Verbeek, Batavorum, 1729.

69. VICQ, D' Azyr. F.—Traite d' Anatomie et de Physiologie, 123 (1) 111 (1) pp. F. A. Didat, Paris, 1786.

70. VON BERGMANN, E.—Die chirurgische Behandlung von Hirnkrankheiten, 189 pp. A. Hirschwald, Berlin, 1888.

71. WALDEYER, W—Untersuchungen Ueber den Ursprung und der Verlauf des Axen-cylinders bei Wirbellosen und Wirbelthieren sowie ueber dessen Endverhalten in der quergestreiften Muskelfaser, *Ztschr. rationalle Med.*, 20 : 193-256, 1863.

72. WALKER, A. EARL.—The Dawn of Neurosurgery *Clin. Neurosurg.* 1-38, 1959.

73. WEIGERT, C. - Ueber eine neue Untersuchungen methode des Zentralnervensystems. *Zentralbl. med. Wissensch.*, 20 : 753-757, 772-774, 1882.

74. WEISS, P.—La Cirugia del Craneo entre los Antiguos Peruanos. 35. pp. Lima, 1949.

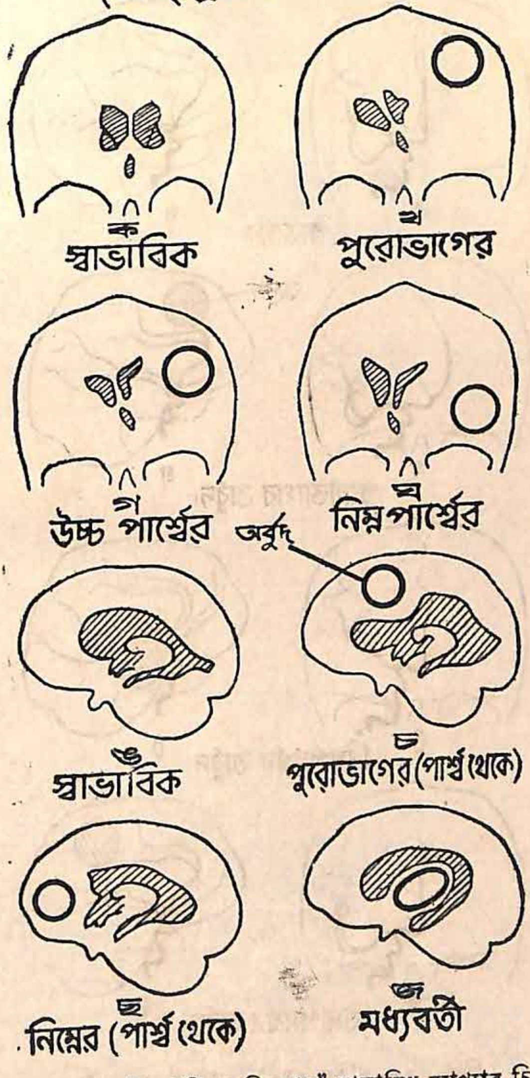
75. WILLIS, T. – Cerebri Anatome cui accessit Nervorum Descriptio et Usus. 18 11, 456. pp. J. Flescher, Londini, 1664.

76. YONGE, J.—Woudps of the Brain Proved Curable, Not only by the Opinion and Experience of Many (the Best) Authors, but the Remarkable History of a Child Four Your Old Cured of Two Very Large Depressions, with the Loss of a Great Part of the Skull, a portion of the Brain. Also Issuing through a Penetrating Wound of the Dura and Pia Mater ;

Published for the Encouragement of Young Chirurgeons and Vindication of the Author, 10 11, 132 pp. H. Faithborn & J. Kersey, London, 1682.

77. ZIMMERMAN, L. M. AND VEITH, I.—Great Ideas in the History of of Surgery, Williams and Wilkins, Baltimore, 1961.

মস্তিষ্ক-নিলয় চিত্রণ
(ভেন্‌ট্রিকিউলোগ্রাফী)

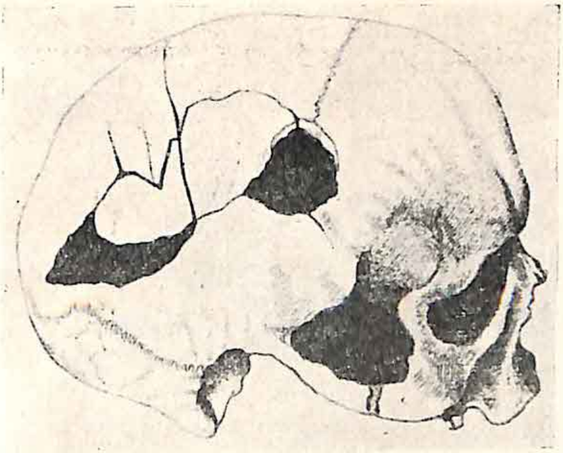


চিত্র ২৬—মস্তিষ্ক "নিলয় চিত্রণের" নানাবিধ ব্যাখ্যার চিত্র।

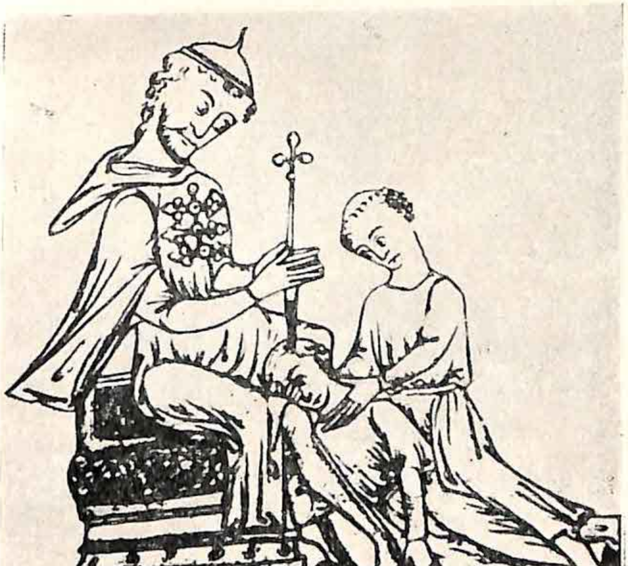
করোটি-ধমনী চিত্রণ
(ক্যারোটিড্ অ্যানজিওগ্রাফী)



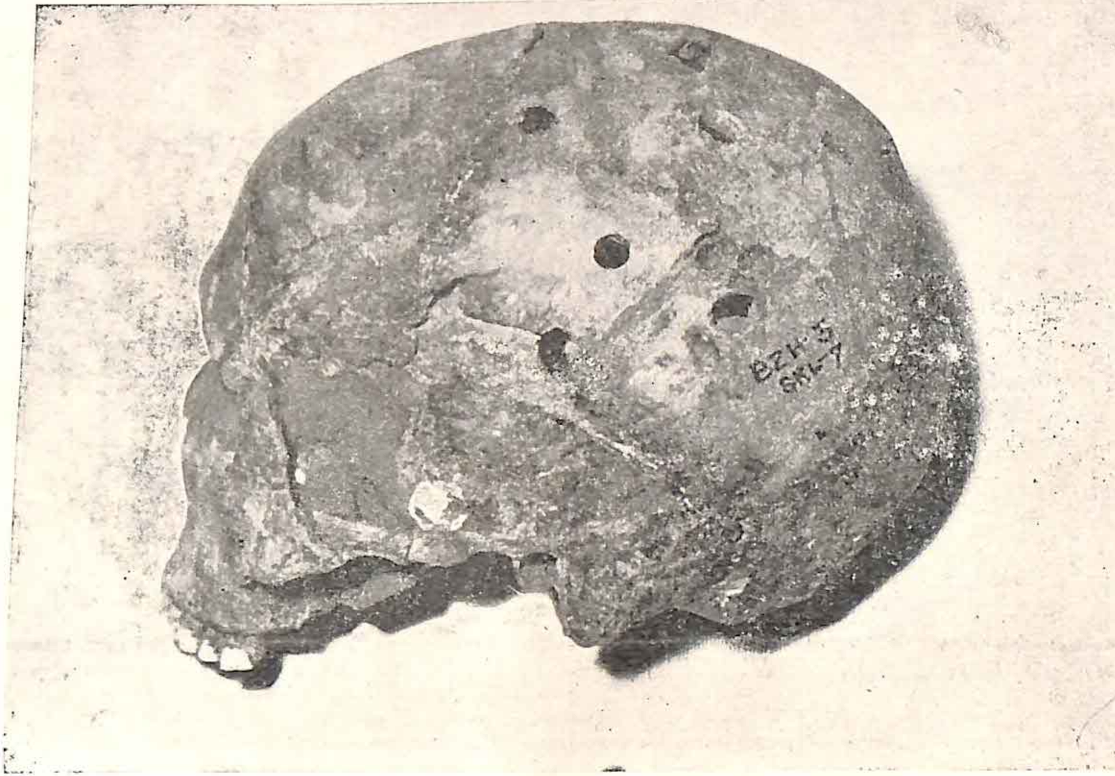
চিত্র ৩২—মস্তিষ্ক ধমনী চিত্রণের ব্যাখ্যা চিত্র।



চিত্র ১—প্রুনিয়েরেস কর্তৃক সংগৃহীত একটি করোটিতে আঘাত ও অস্ত্রপচারের চিত্র।



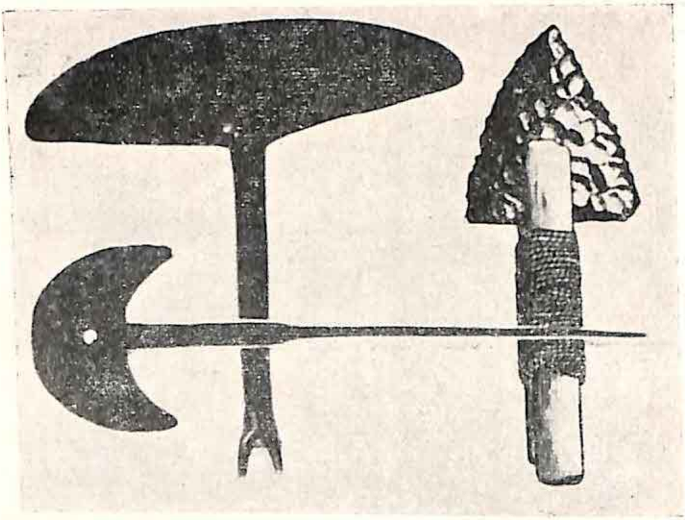
চিত্র ৩—দুই হাতের তালুর সাহায্যে ছিদ্রক যন্ত্র ঘুরিয়ে প্রাচীন শল্য চিকিৎসক কর্তৃক করোটি ছিদ্রকরণ।



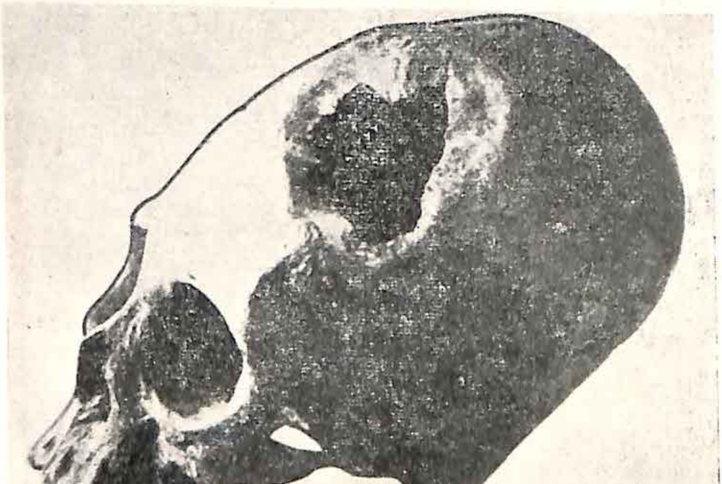
চিত্র ২ (ক) উত্তর কাশ্মীরের বুর্জাহোম নামক স্থানে প্রাপ্ত সছিদ্র করোটি (প্রত্ন-পলীয় যুগ)।



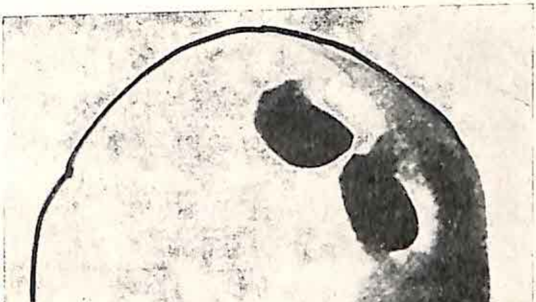
চিত্র ২ (খ)—সিন্ধু অববাহিকার হরপ্পা নামক স্থানে প্রাপ্ত সছিদ্র করোটি (নব-পলীয় যুগ)।



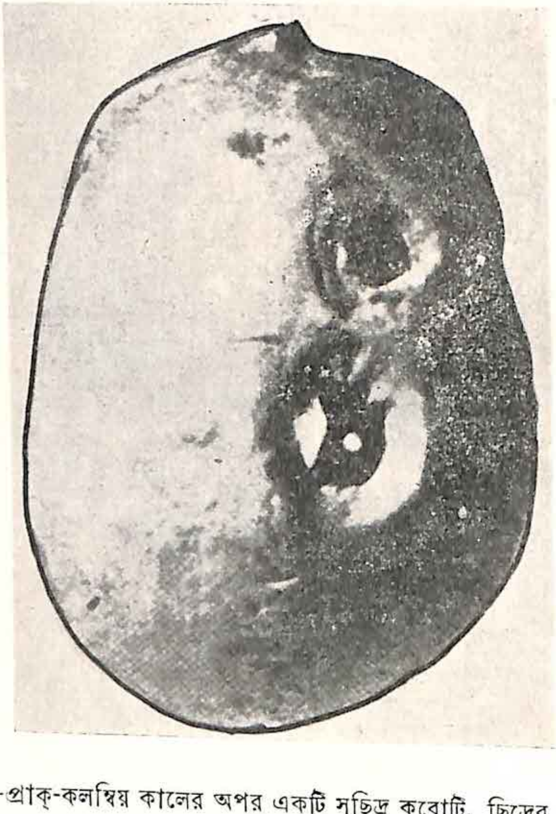
চিত্র ৪—নব-পলীয় যুগের করোটি ছিদ্রণের যন্ত্রাদি, বামে ও মধ্যে তাম্র নির্মিত বাটালি এবং দক্ষিণে আগ্নেয় শিলাফলক নির্মিত একটি ছিদ্রক যন্ত্র।



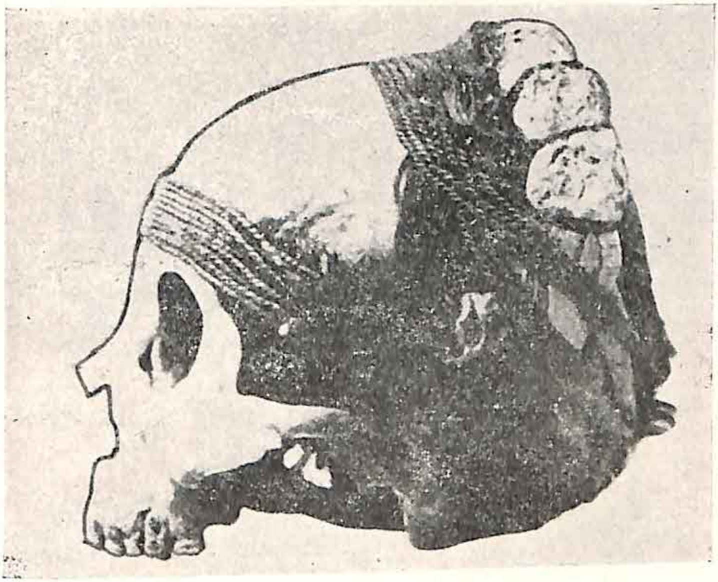
চিত্র ৬—পেরুদেশের প্রাত্তালাকৃতা নামক স্থানের কবর থেকে সংগৃহীত এক সছিদ্র করোটি। ছিদ্রের পরিধি মসৃণ, সুতরাং নবাস্থি উন্মেষ হয়নি (ম্যাক্‌কারডি কর্তৃক সংগৃহীত)।



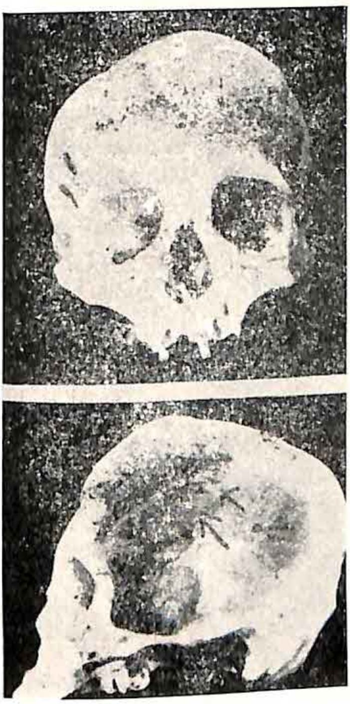
চিত্র ৫—প্রাক্-কলম্বিয় কালের পেরুদেশীয় সছিদ্র করোটি
(জুইয়ার্দ-কর্তৃক সংগৃহীত)।



চিত্র ৭—প্রাক্-কলম্বিয় কালের অপর একটি সছিদ্র করোটি, ছিদ্রের পরিধিতে নবাস্থি উন্মেষের লক্ষণ অতি প্রকট (ম্যাক্কার্ডি কর্তৃক সংগৃহীত)।



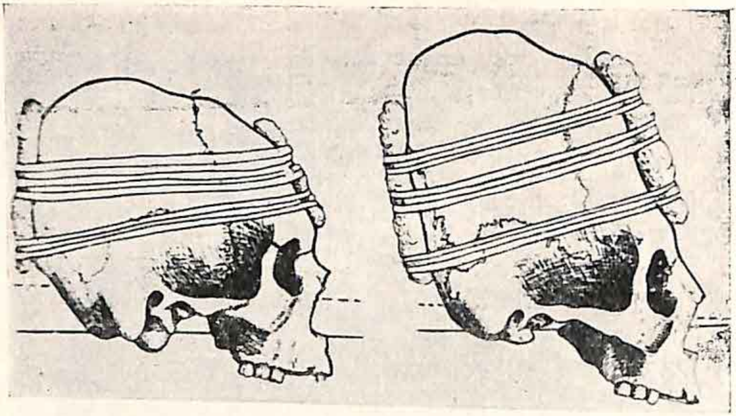
চিত্র ৮— ক্ষত বন্ধনী সমেত একটি প্রাচীন পেরুদেশীয় করোটি।



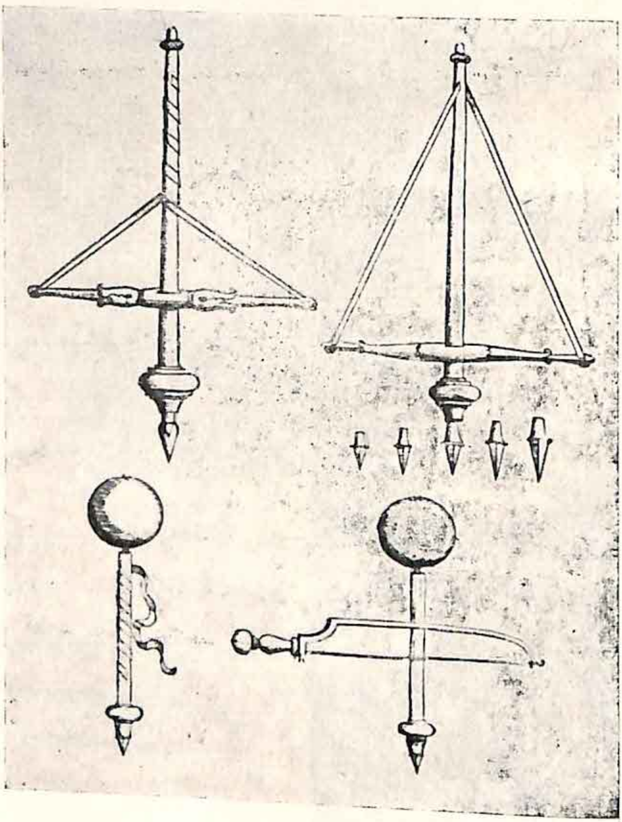
চিত্র ৯—

উপরে—করোটির অস্থির অর্বুদ।

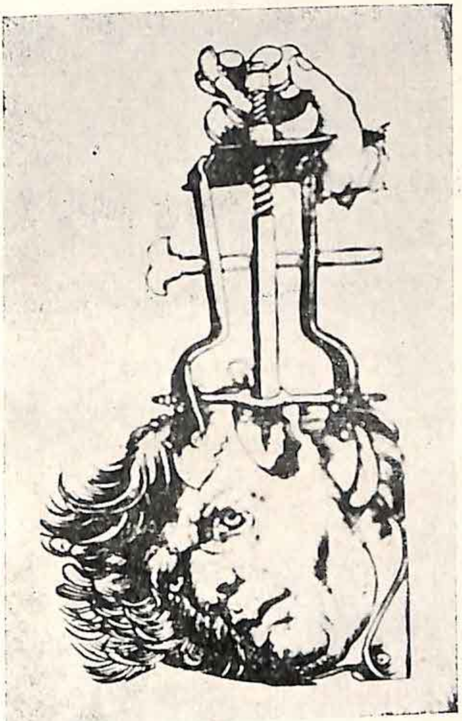
নীচে—অর্বুদটির উপর পেরুদেশীয় এক শল্যবিদের অস্ত্রপচার প্রচেষ্টার নিদর্শন।



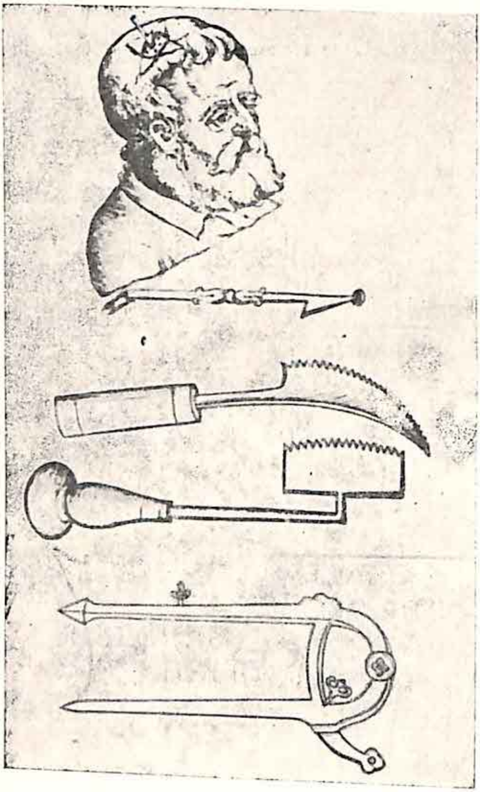
চিত্র ১০—সুদৃঢ় বন্ধনীর সাহায্যে পেরুদেশীয় শিশুদের করোটি বিকৃতকরণ প্রচেষ্টার এক চিত্র।



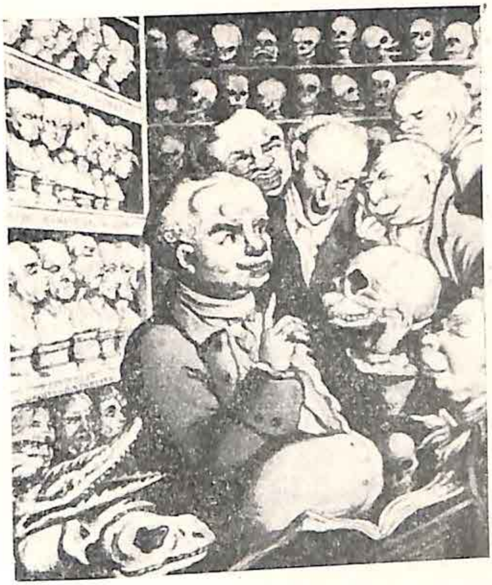
চিত্র ১১—হিপ্পোক্রাতেস্ কর্তৃক ব্যবহৃত কতিপয় করোটি ছিদ্রকের চিত্র।



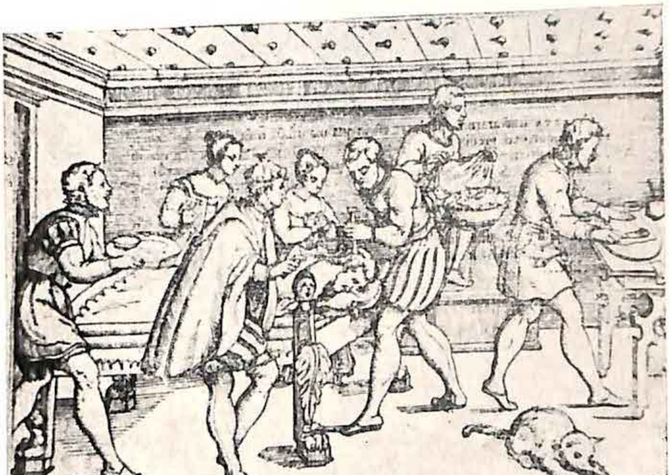
=চিত্র ১২—"ত্রিপদী" যন্ত্রের সাহায্যে করোটির অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট ভগ্নাস্থি উত্তোলন (এলিভেসান্ অব্ ডিপ্রেস্‌ড্ ফ্রাক্‌চার)।



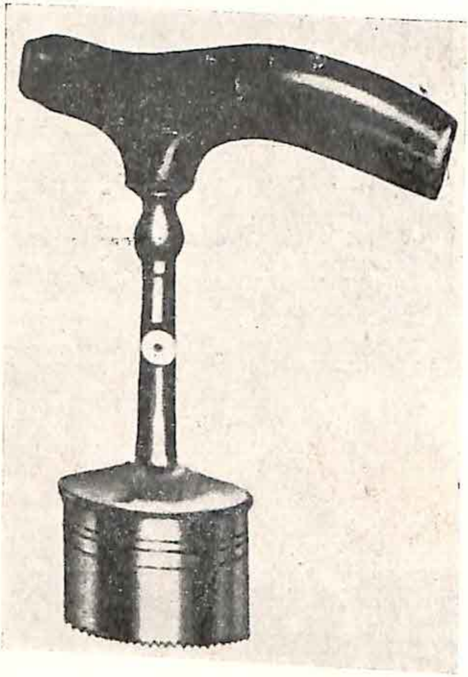
চিত্র ১৩—করোটি ছিদ্রকরণের নানাবিধ করাত (য়ুরোপীয় মধ্যযুগের)।



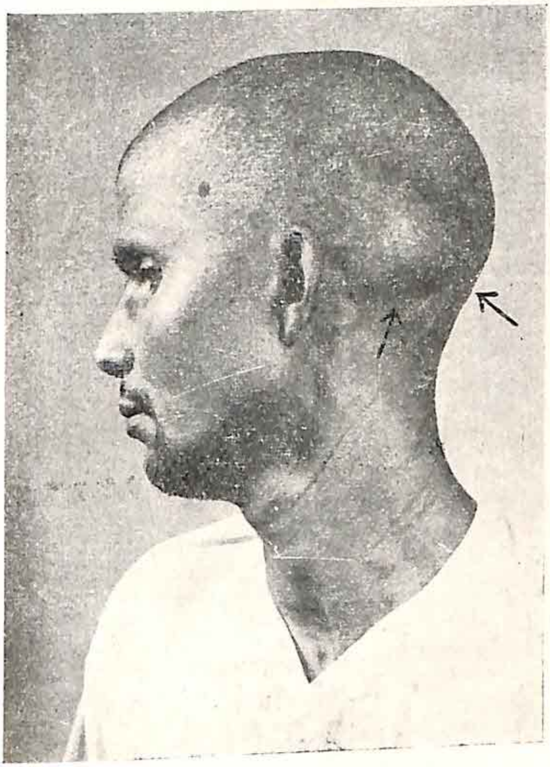
চিত্র ১৪—অতিবিজ্ঞ "মনোবিদ্" বা ফ্রেনোলজিষ্টগণের এক করোটি সংগ্রহশালায় সম্মেলনের এক ব্যঙ্গচিত্র।



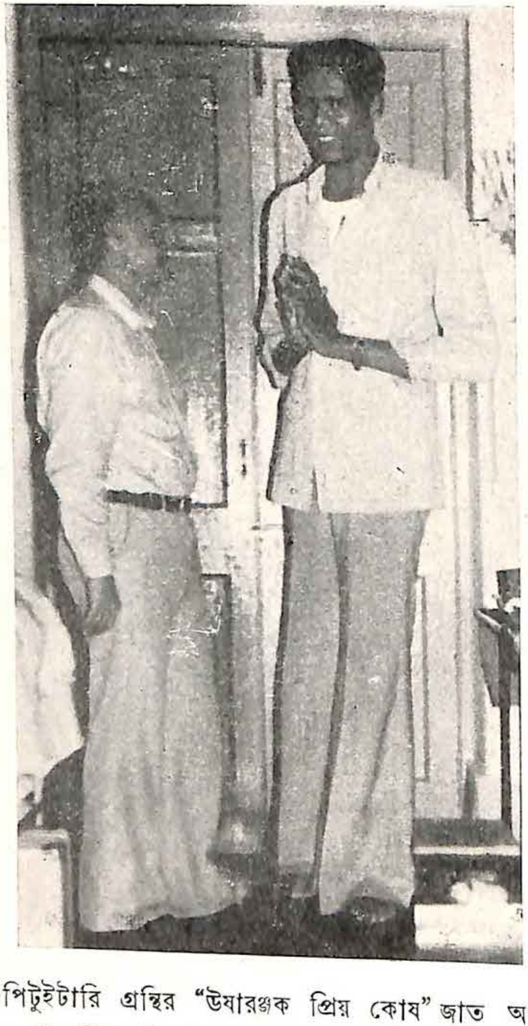
চিত্র ১৫—মধ্যযুগের য়ুরোপে এক করোটি ছিদ্রণের চিত্র।



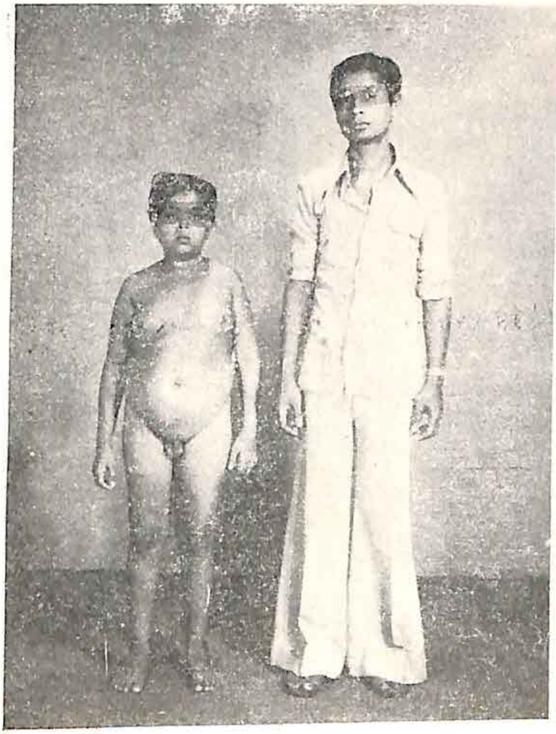
চিত্র ১৬ – ফাব্রিসিউস্ (অ্যাকুয়াপেন্দেন্তে নিবাসী) কর্তৃক উদ্ভাবিত একটি বৃত্ত করাত (ক্রাউন ত্রেফাইন)।



চিত্র ১৭—করোটিভেদী একটি মস্তিষ্কের অর্বুদ-এর বাহ্যপ্রকাশ (তীরচিহ্নিত)।



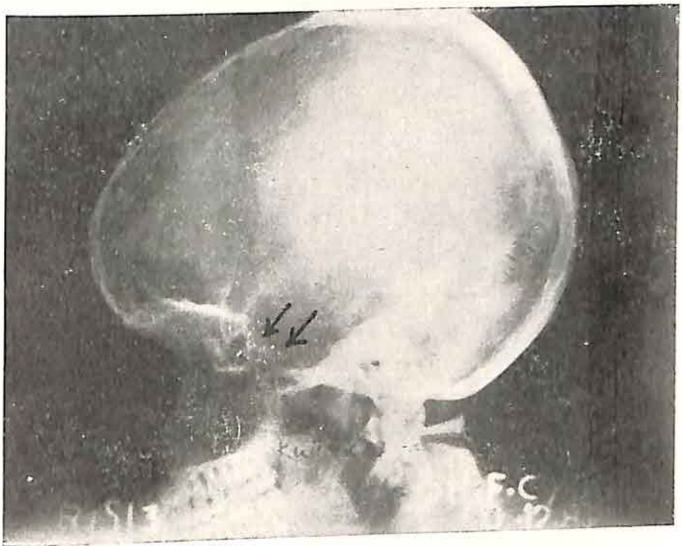
চিত্র ১৮—পিটুইটারি গ্রন্থির "উষারঞ্জক প্রিয় কোষ" জাত অর্বুদের ফলে রোগীর দীর্ঘাকৃতি (সম্মুখে দণ্ডায়মান আমার পরম সুহৃদ্ জার্মানীর ডঃ হান্স হেবরনার্ পিয়া)।



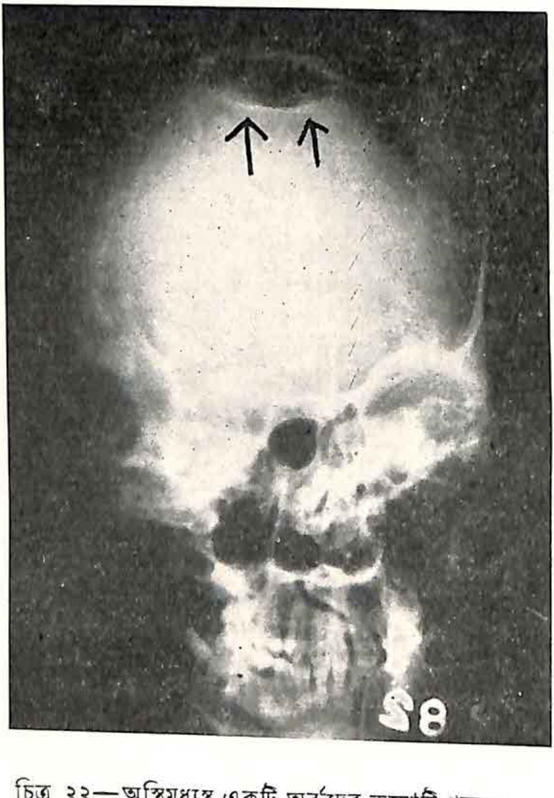
চিত্র-১৯—"রাথ্কের থলি" এর অর্বুদের ফলে খর্বাকৃতি প্রাপ্ত ৩০ বৎসর বয়স্ক এক যুবক (বামে), দক্ষিণে তাহার অনুজ।



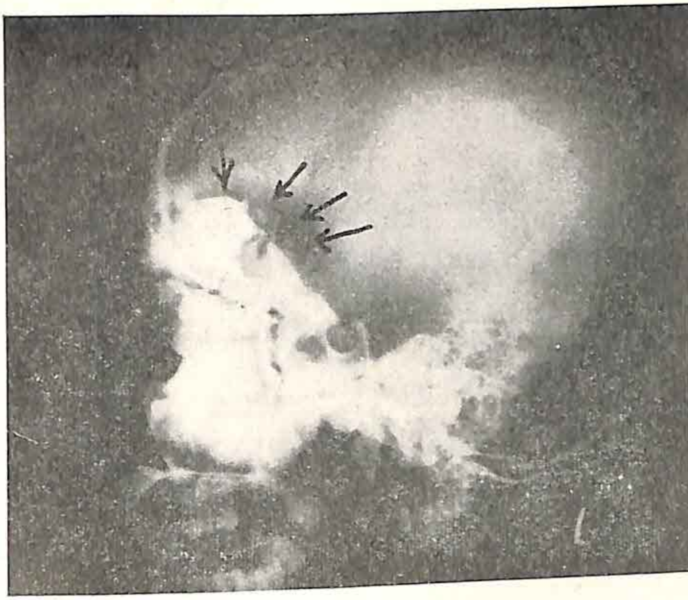
চিত্র ২০—তৃতীয় নিলয়ের অর্বুদের ফলে বালকের অতি
বৃহদাকৃতি শিশ্ন ও কেশবৃদ্ধি।



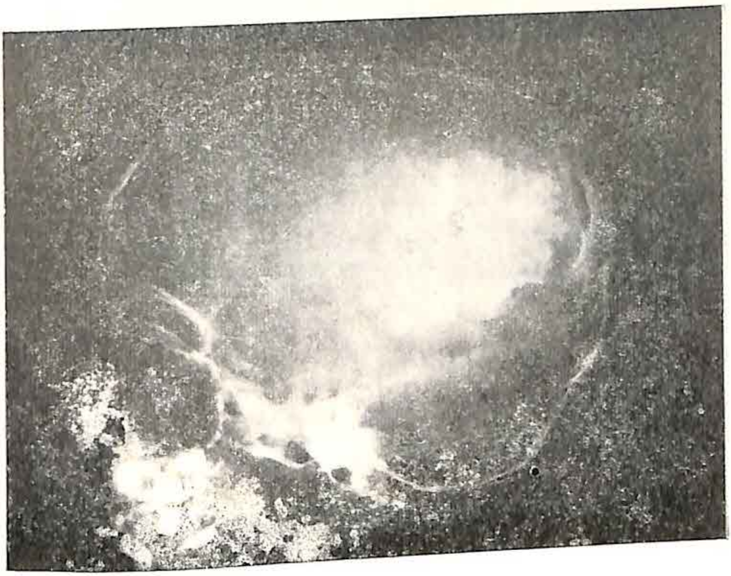
চিত্র ২১—পিটুইটারী গ্রন্থির অর্বুদ কর্তৃক ক্ষয়প্রাপ্ত সেল্লাতুর্চিকা (তীর চিহ্নিত)



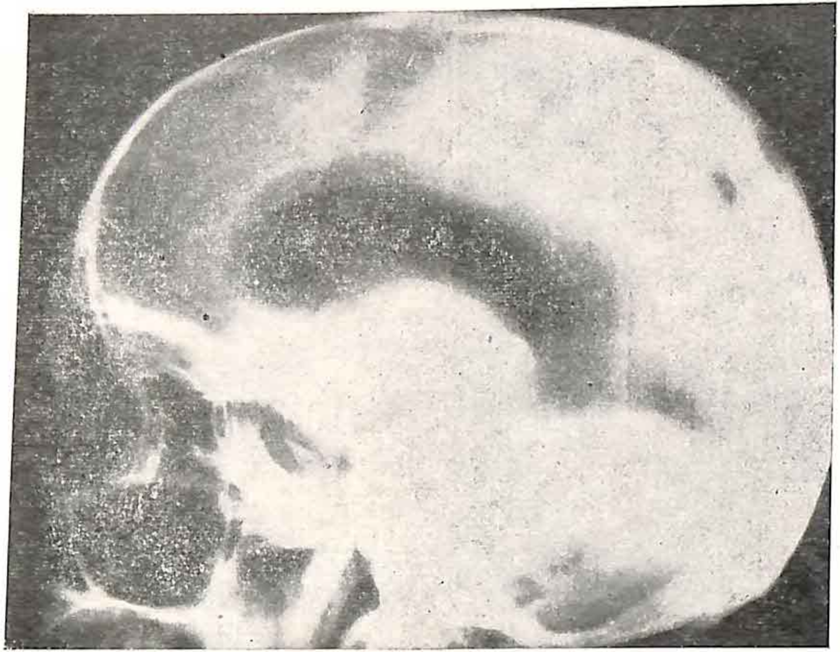
চিত্র ২২—অস্থিমধ্যস্থ একটি অর্বুদের করোটি গহ্বরে
অনুপ্রবেশ (তীর চিহ্নিত)।



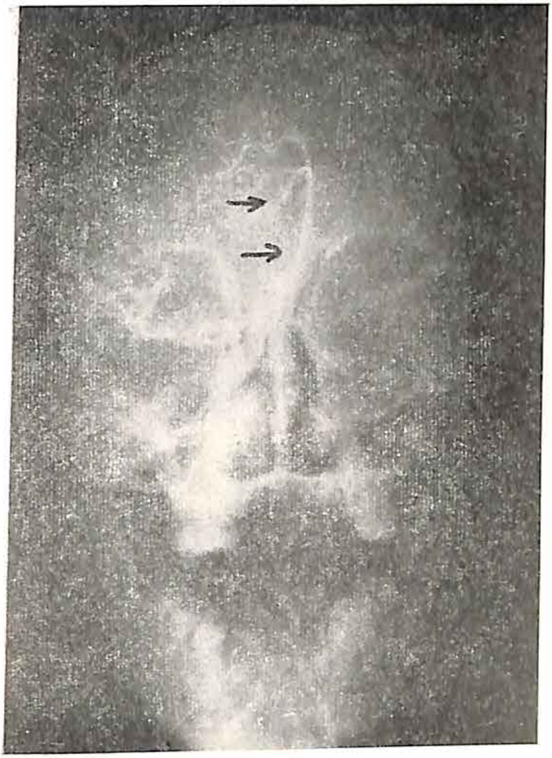
চিত্র ২৩—নাসিকা হইতে উদ্ভূত অস্থির অর্বুদ এর করোটির ভিতর অনুপ্রবেশ (তীর চিহ্নিত)।



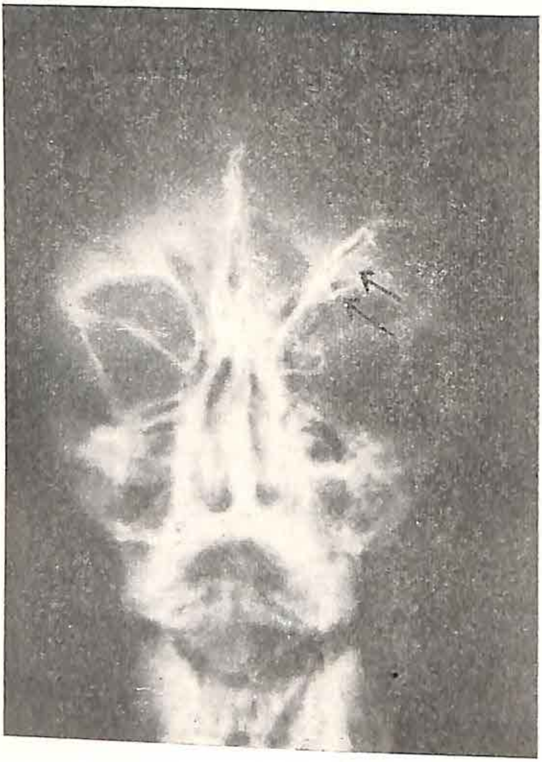
চিত্র ২৪—এক শিশুর মস্তিষ্কের চুনাধরা (ক্যালসিফায়েড) ভীষণধর্মী অর্বুদ।



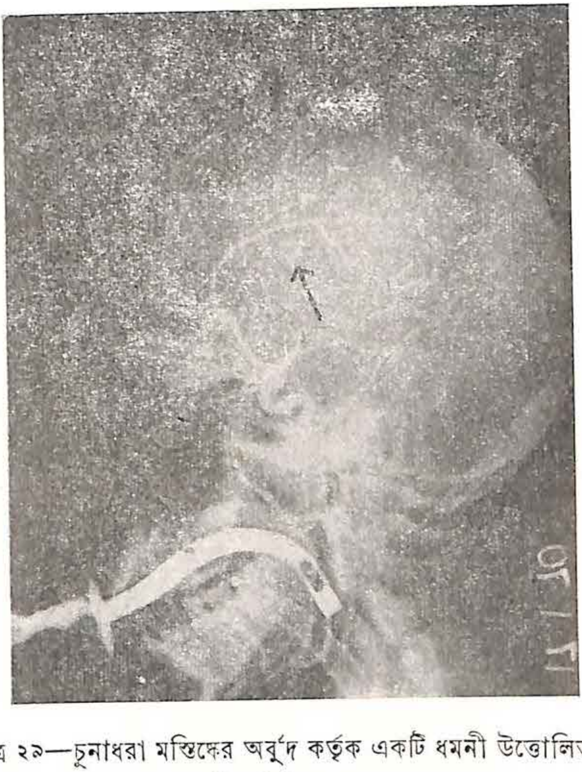
চিত্র ২৫—ওয়াল্‌টার ডাণ্ডি কর্তৃক উদ্ভাবিত বায়ুর দ্বারা মস্তিষ্কের “নিলয় চিত্রণ” বা ভেন্ট্রিকিউলোগ্রাফী ।



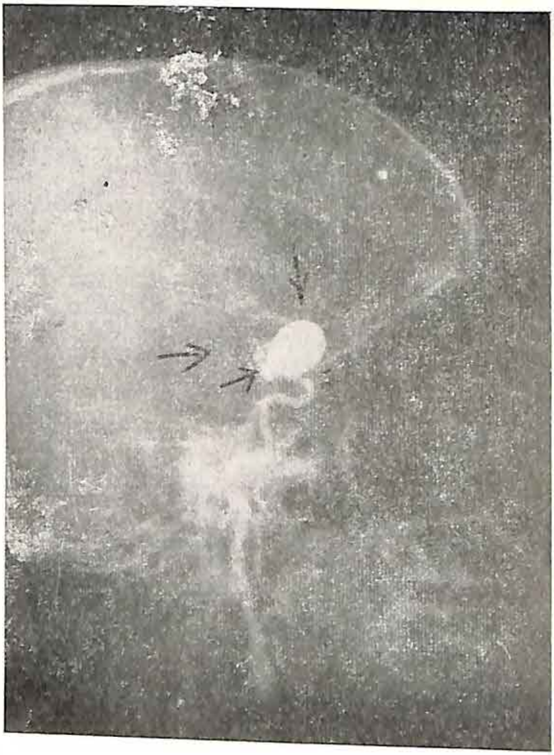
চিত্র ২৭—এক অদৃশ্য মস্তিষ্কের অর্বুদ কর্তৃক মস্তিষ্কের সম্মুখের ধমনীর স্থান-বিচ্যুতি (ধমনী চিত্রণ)।



চিচ ২৮—এক অদৃশ্য মস্তিষ্কের অর্বুদ কর্তৃক পার্শ্ব ধমনী উত্তোলিত (তীর: চিহ্নিত)।



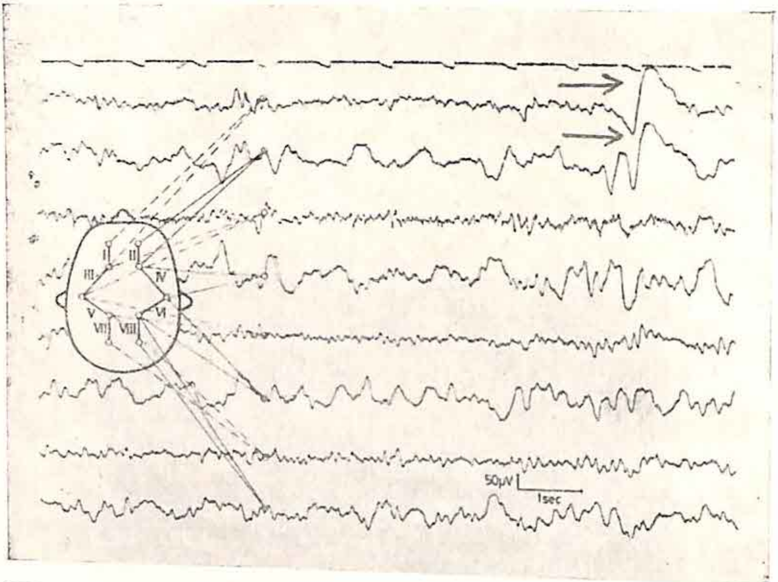
চিত্র ২৯—চুনাধরা মস্তিষ্কের অর্বুদ কর্তৃক একটি ধমনী উত্তোলিত (তীর চিহ্নিত)।



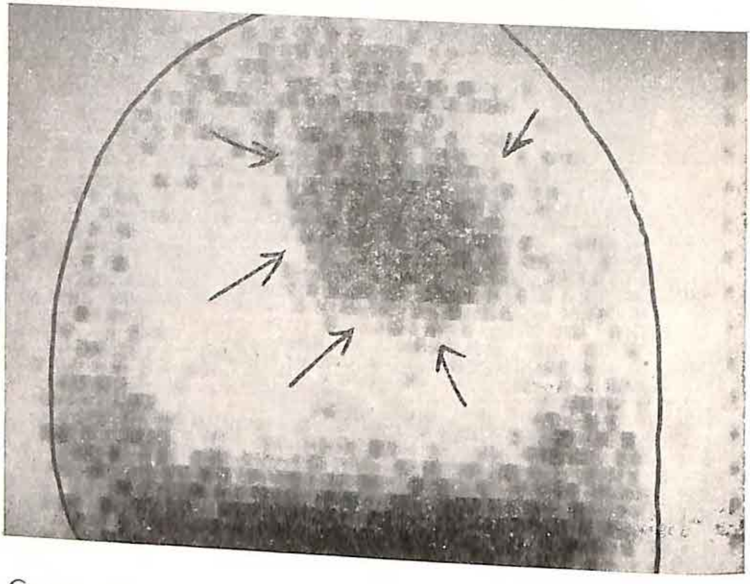
চিত্র ৩০—মস্তিষ্ক ধমনীর স্ফীতিজাত (অ্যানিউরিসম্) অর্বুদ
(তীর চিহ্নিত ধমনী চিত্রণ)।



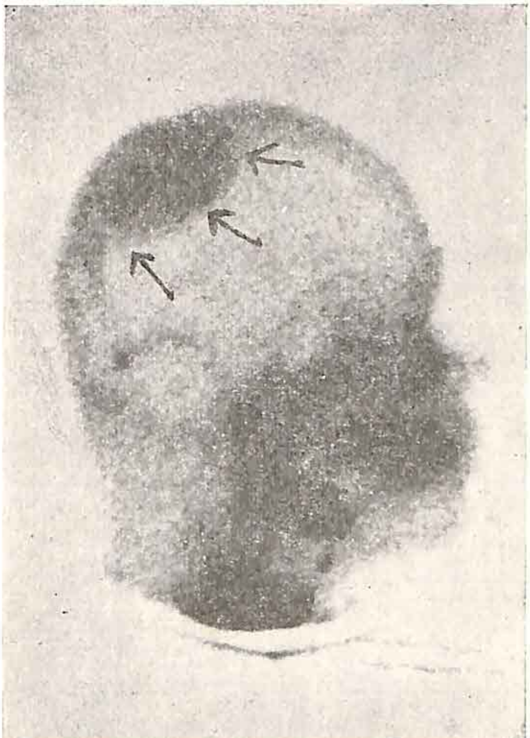
চিত্র ৩১—মস্তিষ্কের অর্বুদ সৃষ্ট ধমনী ও শিরা সমষ্টি
(তীর চিহ্নিত ধমনী চিত্রণ)।



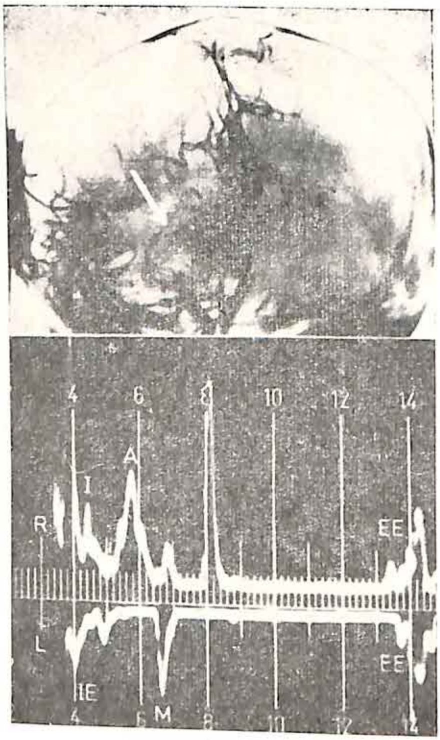
চিত্র ৩৩—হান্‌স বেরগের প্রবর্তিত মস্তিষ্ক বিদ্যুৎলেখন বা ইলেকট্রোএন-সেফালোগ্রাফী দ্বারা মস্তিষ্কের অর্বুদ নির্ণয় (তীর চিহ্নিত)।



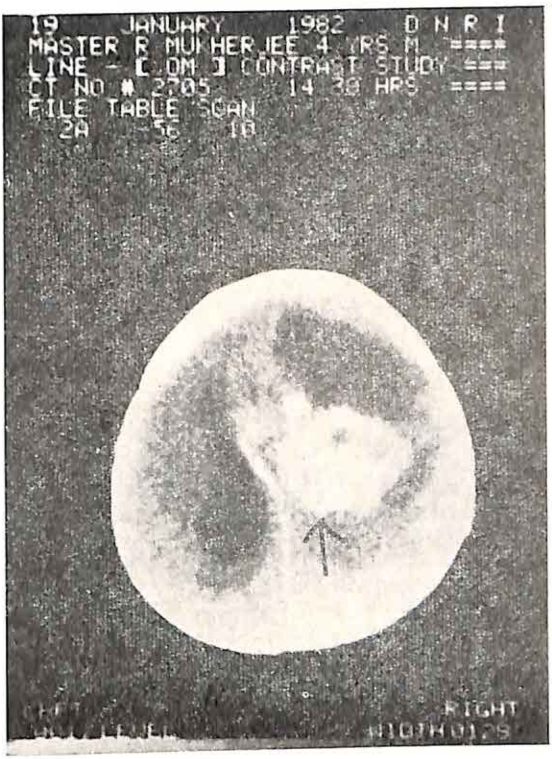
চিত্র ৩৪—সমঘর দ্বারা অর্বুদ চিত্রণ (তীর চিহ্নিত স্থানে সমঘর রাশিকৃত)।



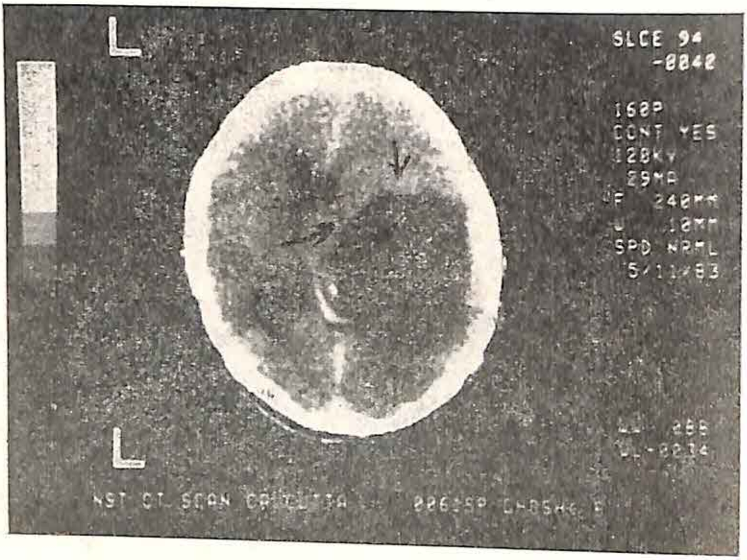
চিত্র ৩৫—সমঘর দ্বারা অপর পদ্ধতিতে মস্তিষ্কের অর্বুদ চিত্রণ
(গামা সিন্টিগ্রাফী, তীরচিহ্নিত)।



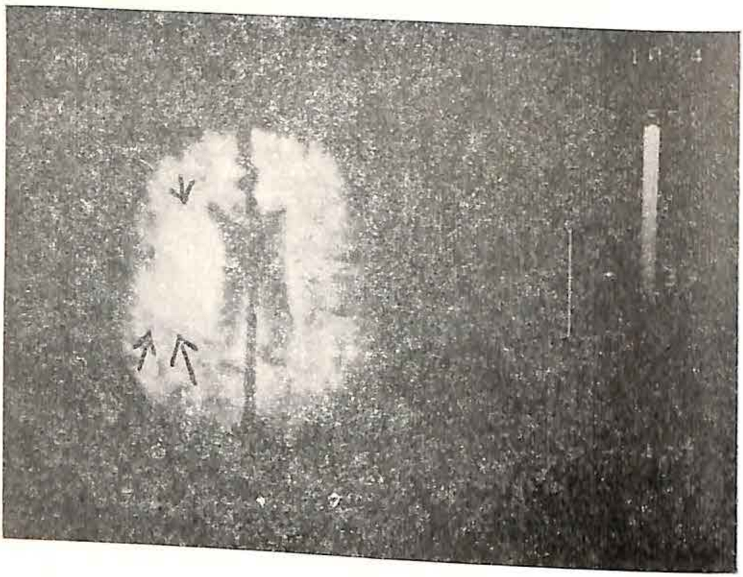
চিত্র ৩৬—শ্রবণাতীত শব্দ তরঙ্গর দ্বারা অর্বুদের স্থান নির্ণয়
(আলট্রাসোনোগ্রাফী)।



চিত্র ৩৭— গাণনিক—স্তর চিত্রণ (কম্প্যুটার টমোগ্রাফী) দ্বারা নিরূপিত মস্তিষ্কের একটি নিরেট অর্বুদ (তীর চিহ্নিত)।



চিত্র ৩৮—গাণনিক-স্তর চিত্রণ দ্বারা নিরূপিত মস্তিষ্কের একটি ফাঁপা অর্বুদ (তীর চিহ্নিত)।



চিত্র ৩৯ —"কেন্দ্রিয় চৌম্বক—প্রতিধ্বনির স্তর চিত্রণ (নিউক্লিয়ার ম্যাগনেটিক্ রেসোনেনস) দ্বারা নিরূপিত একটি মস্তিষ্কের অর্বুদ, (তীর চিহ্নিত)।



চিত্র ৪০—ধনবিদ্যুত বিচ্ছুরী স্তরচিত্রণ (পজিট্রন এমিসান ট্রান্‌সভারস টমো-গ্রাফী) দ্বারা নিরূপিত মস্তিষ্কের ব্যাধিগ্রস্থ একটি অংশ (তীর চিহ্নিত)।



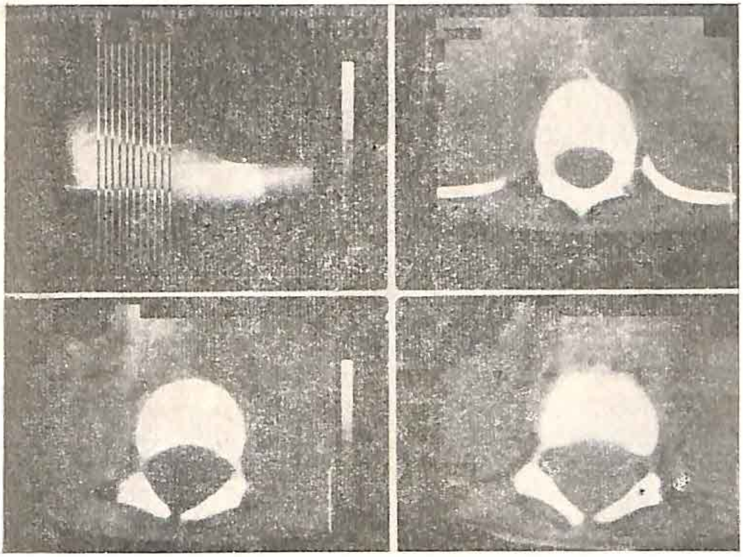
চিত্র ৪১—লেখক কর্তৃক অপসারিত একটি বৃহৎ মস্তিষ্কের অর্বুদ (জালিকোষ জাত, মেনিনজিওমা)।



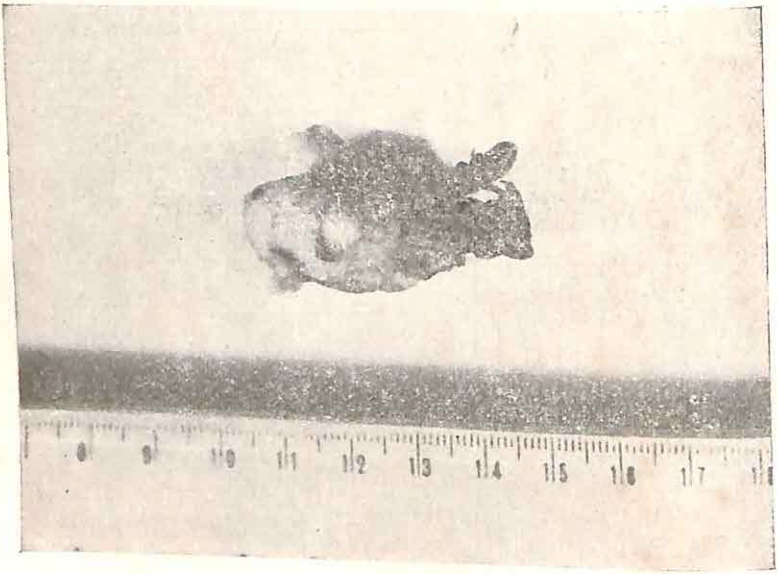
চিত্র ৪২—একটি স্বাভাবিক
সুষুম্না চিত্রণ বা মায়েলোগ্রাফী।



চিত্র ৪৩—অর্বুদ কর্তৃক বিকৃত
একটি সুষুম্না চিত্রণ (তীর চিহ্নিত)।



চিত্র ৪৪—গাণনিক-স্তর চিত্রণ যন্ত্রের সাহায্যে চিত্রিত কশেরুকা ও সুষুম্না।



চিত্র ৪৫—লেখক কর্তৃক অপসারিত একটি সুষুম্নাকাণ্ডের অর্বুদ
(স্নায়ুর খোলসজাত বা নিউরোমা)।

এই ক্ষুদ্র পুস্তকটিতে লেখক অতি সরল ভাষায় স্নায়ু শল্যচিকিৎসা শাস্ত্রের ক্রমবিবর্তনের বিষয়ের ঐতিহাসিক অবতারণা করেছেন। অধ্যায়টীর আরম্ভ প্রাগৈতিহাসিক কালে এবং শেষ বিংশ শতাব্দীতে। বিবরণীটি অতিশয় চিত্তাকর্ষক ও জ্ঞান সমৃদ্ধ। পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে লেখক সরল বাংলায় স্নায়ুমণ্ডলের অর্বুদ বা টিউমার রোগের বিষয় লিখেছেন। অর্বুদের রোগ লক্ষণ, স্থান নিরূপণ, ও বর্তমান কালে প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। বাংলা ভাষায় ইতিপূর্বে উপরিউক্ত বিষয়ে কোনও পুস্তক রচনা করা হয়নি। সুতরাং আপামর জনসাধারণের পক্ষে পুস্তকটী অবশ্য পাঠ্য।

বারো টাকা